ইমাম নববীর

চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ



شرح الأربعين النووية

ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org
email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২৩ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ (একশত আশি) টাকা

شرح الأربعين النووية

ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

الامام يحيى بن شرف الدين النووي (ت ٦٧٦هـ)

লেখক: ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭৬ হি.)

الامام ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ)

ব্যাখ্যাকার: ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭০২ হি.)

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আনসারী
দাওরাতুল হাদীস, জামেয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

সম্পাদনা: মোঃ তরিকুল ইসলাম

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাতা। যিনি সকল সৃষ্টির পরিচালক। যিনি অকাট্য প্রমাণ ও চূড়ান্ত সত্য দলীল সহকারে সঠিক নির্দেশনা ও দীনের যাবতীয় বিধিমালা বর্ণনার জন্য দায়িত্বশীল বান্দাদের প্রতি রসূলগণকে – আলাইহিমুস সালাত ওয়াস সালাম – প্রেরণকারী। আমি তাঁর সকল নিআমতের প্রশংসা করছি। আমি তাঁর নিকট অতিরিক্ত আরো করুণা ও দয়া প্রার্থনা করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো হক মাবূদ নেই। যিনি একক সত্তা। যিনি মহা পরাক্রমশালী। যিনি মহান দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল। যিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং একান্ত সুহৃদ। যিনি সকল সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যিনি কালের ক্রমানুবর্তিতায় অবিচল থাকা স্থায়ী মুজিযা বিশিষ্ট মহান কুরআন ও হেদায়েত সন্ধানীদের আলোকবর্তিকা সদৃশ সুন্নাহ দ্বারা মর্যাদাপ্রাপ্ত। যিনি বহুমুখী অর্থ বিশিষ্ট মর্মবাণী এবং দীনের মহানুভবতা দ্বারা গুণান্বিত। আল্লাহর সমূহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সকল নবী, রসূল, সকলের পরিবার এবং সকল নেককার ব্যক্তিদের ওপর।

পরসমাচার কথা হলো: আমরা বহু সনদে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আলী বিন আবূ ত্বালিব, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মুআয বিন জাবাল, আবুদ দারদা, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, আনাস বিন মালিক, আবূ হুরায়রা ও আবূ

সাঈদ খুদরী রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেছি: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ»

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতকে (আদর্শ) রক্ষার উদ্দেশ্যে দীন সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস আত্মস্থ করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিবসে ফকীহ ও আলেমগণের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্জীবিত করবেন"। অপর বর্ণনায়:

«بَعَثَهُ الله تَعَالى فَقِيهًا عَالِمًا».

"আল্লাহ তা'আলা তাকে আলেম ও ফকীহরূপে পুনর্জীবিত করবেন"। আবুদ দারদার বর্ণনা অনুসারে:

«وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَافِعًا وَشهِيدًا».

"আমি কিয়ামত দিবসে তার পক্ষে সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব"।

ইবনু মাসউদের বর্ণনা অনুসারে:

ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ.

"তুমি জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পার"। ইবনু উমারের বর্ণনা অনুসারে:

«كُتِبَ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ ، وَحُشِرَ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ»

"আলেমগণের তালিকায় তার নাম লিখে দেওয়া হবে এবং শহীদদের সারিতে শামিল করে তাকে হাশরের মাঠে উঠানো করা হবে"।

হাদীসের হাফেযগণ উপরের হাদীসগুলো দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যদিও হাদীসটির অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সনদ রয়েছে।

এই বিষয়ে আলেমগণ – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম – বহু গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এই বিষয়ে সর্ব প্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আমি জানি: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। এরপরে মহান আল্লাহভীরু আলেম মুহাম্মাদ বিন আসলাম তূসী। এরপরে হাসান বিন সুফয়ান নাসায়ী, আবূ বকর আজুররী, আবূ বকর বিন ইবরাহীম আসফাহানী, দারাকুতনী, হাকিম, আবূ নুআইম, আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামী, আবূ সাঈদ মালীনী, আবূ উসমান আস সাবূনী, আবূ বকর বায়হাকী। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মাঝে অনেক আলেম এই বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আমি ইসলামের উক্ত মহান সুপরিচিত ইমাম ও হাফেযগণের আদর্শ অনুকরণে চল্লিশটি হাদীস সংকলনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিখারা করেছি। আলেমগণ আমলের ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে দুর্বল হাদীসের ওপরে আমল করার বৈধতার প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কিন্তু এরপরেও, উপরের হাদীসটির ওপরে আস্থা রাখতে পারছি না। বরং আমার আস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ওপরে:

«لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ»

"তোমাদের মাঝে উপস্থিত ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (আমার বার্তা) পৌঁছে দেয়"। সহীহ বুখারী হা/১০৫, সহীহ মুসলিম হা/১৬৭৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ওপরে:

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

“আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শুনে সেটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে এবং তা ঠিক যেভাবে শুনেছিল সেভাবেই অপরের নিকট পৌঁছে দিয়েছে”। সহীহ: তিরমিযী হা/২৬৫৮, ইবনে মাজাহ হা/২৩৩।

আলেমদের মাঝে অনেকেই এমন আছেন, যারা দীনের মূলনীতি সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস সংকলন করেছেন। কেউ দীনের শাখাগত বিধান সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস সংকলন করেছেন। কেউ কেউ হয়তো জিহাদ সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস সংকলন করেছেন। কেউ কেউ যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) সম্পর্কে সংকলন করেছেন। কেউ কেউ শিষ্টাচার সম্পর্কে সংকলন করেছেন। কেউ কেউ ভাষণ সম্পর্কিত হাদীস সংকলন করেছেন। এগুলোর প্রত্যেকটিই নেক বিষয়বস্তু। আল্লাহ তা‘আলা এই বিষয়বস্তুগুলোর সংকলকদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এই সকল উদ্দেশ্যের চাইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সাধারণভাবে চল্লিশটি হাদীস সংকলন করার বিষয়টিকে। আর তা হলো সকল বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত চল্লিশটি হাদীসের একটি সংকলন। যেখানে প্রত্যেকটি হাদীসই দীনের একটি মহান মূলনীতি বিশিষ্ট হবে। যেই হাদীসকে আলেমগণ ইসলামের ভিত্তি অথবা ইসলামের অর্ধাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ অথবা এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এরপরে আমি এই চল্লিশটি হাদীস সহীহ হওয়ার অনিবার্য নীতি সামনে রেখে সংকলন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবো। যেগুলোর অধিকাংশই সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিদ্যমান। এবং হাদীসগুলোকে আমি সনদবিহীনরূপে উল্লেখ করবো। যাতে করে সেগুলো আত্মস্থ করা সহজ হয়। আর সেগুলো দ্বারা যেনো সার্বিক পর্যায়ে কল্যাণ হাসিল করা যায়। ইনশা আল্লাহু তা‘আলা। এরপরে আমি হাদীসগুলোর নিগূঢ় শব্দসমূহ আত্মস্থ করার লক্ষ্যে একটি ভিন্ন অধ্যায় রচনা করবো।

আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, এই হাদীসগুলোর মাঝে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত

যাবতীয় ইবাদত সম্পর্কিত নির্দেশনা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট, যে এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করে। একমাত্র আল্লাহর ওপরেই আমার ভরসা। একমাত্র তাঁরই নিকট আমার আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরশীলতা। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সাহায্য ও প্রতিরক্ষা একমাত্র তাঁরই নিকট কামনা করছি।

إنما الأعمال بالنيّات

হাদীস-১: সকল কাজের ফলাফল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ ":إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ. "

رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغِيرَة بن بَرْدِزبَه الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ بنُ الْحَجَّاج بن مُسْلِم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي "صَحِيحَيْهِمَا" اللذينِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

“সকল কাজের ফলাফল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়্যাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে

হয়েছে। যার হিজরত দুনিয়ার জন্য অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত সেজন্য বিবেচিত হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।”

মুহাদ্দিসগণের দুই ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদেযবাহ আল-বুখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুশায়রী আন্-নিশাপুরী আপন আপন সহীহ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থদ্বয় বলে বিবেচিত হয়। [সহীহ আল-বুখারী হা/১, সহীহ মুসলিম হা/১৯০৭।] এই হাদীসটি সহীহ, যেই বিষয়ে সকলেই একমত। এই হাদীসের বিস্তৃত পরিধি, মর্যাদা ও অসংখ্য প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিদ্যমানঅনেক উপকারিতা বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। হাদীসটির বিস্তৃত পরিধি, মর্যাদা ও অনেক উপকারিতা রয়েছে। ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ বুখারী তার কিতাবের একাধিক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ এর শেষাংশে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে যে হাদীসগুলোর ওপরে সেগুলোর মাঝে অন্যতম এ হাদীসটি। ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন:

يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم

“সকল কাজের ফলাফল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।” এই হাদীসটির মাঝে এক তৃতীয়াংশ জ্ঞান বিদ্যমান।

ইমাম বায়হাক্বী ও অন্যান্য আলেম এটা বর্ণনা করেছেন। এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো: বান্দার কর্ম তার অন্তর, মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয়। আর নিয়্যাত এই তিন প্রকারের একটি। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি ফিকহের

সত্তরটি অধ্যায়ে প্রয়োগযোগ্য। আরেক দল আলেম বলেছেন: এই হাদীসটি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ।

আলেমগণ এই হাদীস দ্বারা সংকলিত গ্রন্থসমূহ সূচনা করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। এই হাদীস দ্বারা যারা গ্রন্থের সূচনা করেছেন তাদের মাঝে অন্যতম হলেন: ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ আল বুখারী। আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেছেন: প্রত্যেক গ্রন্থ সংকলক ব্যক্তির জন্য তার গ্রন্থটিকে এই হাদীস দ্বারা সূচনা করা উচিত, যাতে নিয়্যাত সহীহ করার ব্যাপারে পাঠককে সতর্কীকরণ করা যায়।

এই হাদীসটির শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করলে মাশহূর বিবেচিত হবে। আর প্রথমাংশের প্রতি লক্ষ্য করলে গরীব বিবেচিত হবে। যেহেতু হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একমাত্র উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বীয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর উমার থেকে একমাত্র আলক্বামা বিন আবী ওয়াক্কাস ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর আলক্বামার থেকে একমাত্র মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তায়মী ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম থেকে একমাত্র ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এর পরবর্তী প্রজন্মের নিকট হাদীসটি মাশহূর হয়ে যায়। এরপরে তার থেকে প্রায় দুইশতাধিক মানুষ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাদের অধিকাংশরাই হলেন ইমাম।

إنما – শব্দটি বাক্যের সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়: উল্লিখিত বিষয়টি সাব্যস্ত করে এবং অনুল্লিখিত বিষয়কে নাকচ করে। এটা কখনো পূর্ণাঙ্গ সীমাবদ্ধতার দাবি রাখে। আবার কখনো কখনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দাবি রাখে। এটা বিভিন্ন নির্দেশিকা দ্বারা বুঝা যায়। যেমন:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ} "আপনি একমাত্র সতর্ককারী"।

সূরা আর রাদ ১৩:৭। আয়াতটির বাহ্যিক দাবি হলো: রসূলের কাজ সতর্ক করণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর আরো অনেক

সুন্দর গুণাবলি রয়েছে: যেমন, সুসংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি। একইভাবে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: {إِنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ} "দুনিয়ার জীবন একমাত্র খেল-তামাশা এবং কষ্ট-ক্লেশের মাঝেই সীমাবদ্ধ"। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৬। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ – আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন – হয়তো দুনিয়ার জীবনের পরিণাম কেন্দ্রিক। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো এটা কল্যাণ ও সওয়াবের মাধ্যম। আবার সীমাবদ্ধতাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিষয়কে প্রাধান্য প্রদান এই মূলনীতির ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। সুতরাং যখন এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সঠিকভাবে বিবেচনা করবে। যদি বাক্যের প্রাসঙ্গিকতা ও মূল ভাষ্য নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে, তাহলে সেটাই বলো। অন্যথায় সীমাবদ্ধতার অর্থকে পূর্ণাঙ্গ সীমাবদ্ধতার ওপরেই প্রয়োগ করো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীতে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা বিশিষ্ট শব্দটি এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। **আমল দ্বারা উদ্দেশ্য** হলো: **শারঈ আমলসমূহ।**

হাদীসটির অর্থ: নিয়্যাত ব্যতীত আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন: ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম। একইভাবে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, ইতিকাফ ও অন্যান্য সকল ইবাদত। অবশ্য নাপাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নিয়্যাতের আবশ্যকীয়তা নেই। যেহেতু এটা পরিহার করার বিষয়। আর পরিহার করতে কোনো নিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা নেই। একদল আলেমের মতে: ওযূ ও গোসল নিয়্যাত ব্যতীত সহীহ হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য "আমলসমূহ নিয়্যাতের ওপরে নির্ভরশীল" এতে একটি শব্দ উহ্য আছে। তবে বাক্যটিতে কোনো শব্দ উহ্য আছে কি-না এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। যারা নিয়্যাতকে শর্ত বলেছেন, তাদের মতে উহ্য শব্দটি হলো: সিহহাতুল আমাল বিন নিয়্যাত তথা আমলের বিশুদ্ধতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। আর যারা নিয়্যাতকে শর্ত বলেননি, তাদের মতে উহ্য শব্দটি হলো: কামালুল আমাল বিন নিয়্যাত। তথা আমলের পূর্ণতা নিয়্যাতের ওপরে নির্ভরশীল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “প্রত্যেকেই তার নিয়্যাত অনুসারে কর্মফল পাবে”। এই বিষয়ে ইমাম খাত্তাবী বলেছেন: এই বাক্যটি ভিন্ন আরেকটি বিশেষ অর্থের প্রতি নির্দেশ করছে, যা প্রথমটিতে নেই। আর সেটা হলো আমলকে নিয়্যাত দ্বারা নির্দিষ্টকরণ। শায়েখ মুহিউদ্দীন নববী একটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করেছেন, সেটা হলো: নিয়্যাতসিদ্ধ বিষয়টি নির্দিষ্ট করা শর্ত।

সুতরাং কোনো মানুষের ওপরে যদি কাযা সালাত থাকে, তাহলে তার জন্য শুধুমাত্র অনাদায়ী সালাত এর নিয়্যাত করা যথেষ্ট হবে না। বরং তার জন্য শর্ত হলো: সালাতটি যূহর, আসর অথবা অন্য কোন সময়ের সালাত তা নির্ধারণ করা। যদি দ্বিতীয় বাক্যটি অনুপস্থিত থাকত, তাহলে প্রথমটির দাবি অনুসারে অনির্দিষ্টভাবেই নিয়্যাত সহীহ হতো বলে প্রতীয়মান হয়। অথবা প্রথম বাক্যটি এমন মর্মের দাবি রাখে বলে ধারণা সৃষ্টি হতো। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাধিত হয়, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথেই সাধিত বলে বিবেচিত হবে”।

আরবী ভাষাবিদগণের নিকট স্বীকৃত মূলনীতি হলো: শর্ত, জাযা এবং মুবতাদা ও খবর অবশ্যই একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হবে। আর এখানে উভয়টির মাঝে একাত্মতা সংঘটিত হয়েছে। যার হিজরত নিয়্যাত ও স্বেচ্ছায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাধিত হয়, তার হিজরত বিধানগত ও আইনগতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথের হিজরত বলেই বিবেচিত হবে।

এই হাদীসটির একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আলেমগণ বর্ণনা করেছেন: একজন ব্যক্তি উম্মে কায়স নামী জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে। সে এর দ্বারা হিজরতের মহত্ব অর্জন করতে চায়নি। তাই তাকে এই নাম ধরে ডাকা হতো: মুহাজিরু উম্মি কায়স। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

بيان الإسلام والإيمان والإحسان

হাদীস-২: ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের ব্যাখ্যা

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنْ اسْتَطَعْت إلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْت . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟. قَلَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

এটাও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: "হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন"। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

"ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ করা।"

তিনি (লোকটি) বললেন: "আপনি ঠিক বলেছেন"। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: "আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন:

"ঈমান হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতর ওপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনা।"

সে (আগন্তুক) বলল: "আপনি ঠিক বলেছেন"। তারপর বলল: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন"। তিনি বলেন:

"ইহসান হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন: "যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা

বেশি কিছু জানে না"। সে (আগন্তুক) বলল: "আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন:

"তা হচ্ছে- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নিয়ে দম্ভ করবে"।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেন: "হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললাম: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভালো জানেন"। তিনি বললেন: "তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম: হা/৮।]

ব্যাখ্যা: এটা একটা মহত ও মর্যাদাপূর্ণ হাদীস, যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার আমলের কর্তব্যমূলক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর শারঈ জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা এর ওপরেই ভিত্তিশীল। এর শেকড় থেকেই ডালপালায় রূপান্তরিত হয়। যেহেতু এটা সুন্নাহর জ্ঞানকে শামিল করেছে। এটা যেনো সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য জন্মদাত্রী মাতা সদৃশ। যেভাবে সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে। যেহেতু সেটা সমস্ত কুরআনের যাবতীয় অর্থকে ধারণকারী।

এই হাদীসে আলেম, জ্ঞানী ও শাসক সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎকালে উত্তম পোশাক, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নেওয়ার দলীল বিদ্যমান রয়েছে। কারণ জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর অবস্থা ও বক্তব্য উভয়টির দ্বারা সংশ্লিষ্ট লোকদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

রাবী (উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য: "তার শরীরে ভ্রমণের কোনো চিহ্ন দৃশ্যমান হচ্ছিল না"। এখানে يرى – শব্দটির ياء – অক্ষরে পেশ সহকারে উচ্চারণটিই প্রসিদ্ধ। যা মাজহূল ফেল থেকে গঠিত হয়েছে। কেউ কেউ শব্দটিকে যবর বিশিষ্ট نون সহকারে বর্ণনা করেছেন। উভয়টিই সঠিক।

রাবীর বক্তব্য: “তিনি নিজের উভয় হাতের তালু তাঁর উরুতে রাখলেন এবং বললেন: (হে মুহাম্মাদ) এই বক্তব্যটিই প্রসিদ্ধ এবং সহীহ। ইমাম নাসায়ী একই অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: তিনি স্বীয় দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উরুতে রাখলেন”। ফলে মুসলিম শরীফে বর্ণিত শব্দের মাঝে বিদ্যমান শব্দের দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি দূরীভূত হয়ে গেল। কারণ সেখানে বলা হয়েছে: (এরপরে তিনি স্বীয় দুই হাতের তালু তাঁর উরুতে রাখলেন। আর এই বাক্যটি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এই হাদীসটি থেকে এই বিষয় উপলব্ধি করা যায়: আভিধানিক ও শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও ঈমান উভয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বিষয়। আর ভিন্ন ভিন্ন নাম বিশিষ্ট বস্তুগুলোর মাঝে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচ্য। কখনো কখনো শরীআত উভয়টিকেই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। ফলে রূপক অর্থে একটিকে অপরটির ওপরে প্রয়োগ করা হয়।

রাবীর বক্তব্য: “সুতরাং আমরা তাঁর প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর সত্যায়ন করতে দেখে অভিভূত হলাম”। তারা এই কারণেই আশ্চর্য হয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত দীন সম্পর্কে একমাত্র তাঁরই নিকট থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর এই প্রশ্নকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত করেছেন কি-না অথবা তাঁর নিকট থেকে কিছু শুনেছেন কি-না তা তাদের জানা ছিল না। তা ছাড়াও তাঁর প্রশ্নটি ছিল একজন জ্ঞানী বিশ্লেষক ও সত্যায়নকারীর ন্যায়। এই কারণেই তারা আশ্চর্য হয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: “ঈমান হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতর ওপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনা”।

ঈমান বিল্লাহ হলো: মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি বিদ্যমান, তিনি মর্যাদা এবং পূর্ণাঙ্গতার গুণে গুণান্বিত, সকল প্রকার কমতি বা ত্রুটিপূর্ণ গুণ থেকে পবিত্র। তিনি হলেন একক সত্তা, মহা সত্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অদ্বিতীয়, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। যেখানে

ইচ্ছা হয় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তাঁর মালিকানাধীন রাজ্যে যা ইচ্ছা হয়, তাই করেন।

ঈমান বিল মালায়িকাহ: ফেরেশতাগণের প্রতি এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা হলেন আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা। তাঁরা কখনো আল্লাহর পূর্বে কোনো কথা বলে না। বরং তাঁরা তাঁর আদেশ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে।

ঈমান বি রুসুলিল্লাহ: নবী রাসূলগণের প্রতি এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে যেই বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, সেই বিষয়ে তাঁরা সত্যবাদী। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের সত্যতার পক্ষে অলৌকিক মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর রিসালাত (ঐশী বার্তাসমূহ) পৌঁছে দিয়েছেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতি আল্লাহর ধার্যকৃত আদেশসমূহ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নির্ণয় না করা ওয়াজিব।

ঈমান বিল ইয়াওমিল আখির: কিয়ামত দিবস এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি যেমন: মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়া, হাশর-নাশর, হিসাব, দাঁড়িপাল্লা, সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়কে সত্যায়ন করা। আর জান্নাত-জাহান্নাম হচ্ছে নেককার ও গুনাহগার ব্যক্তিদের জন্য যথাক্রমে সওয়াব ও শাস্তির ঠিকানা ইত্যাদিসহ আরো যেই সকল বিষয়ে সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

ঈমান বিল কাদর: পূর্বে বর্ণিত বিষয়সমূহ যথাসময়ে সংঘটিত হবে এই মর্মে উক্ত বিষয়গুলোকে সত্যায়ন করা। এই শাখার মূল মর্ম আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে নির্দেশ করা হয়েছে:

{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্ম সৃষ্টি করেছেন"। সূরা আস সাফফাত ৩৭:৯৬। আর এই বাণীতে নির্দেশ করা হয়েছে:

{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}

"নিশ্চয় আমরা প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি পরিমাণ অনুসারে" সূরা আল কামার ৫৪:৪৯। ইত্যাদি।

এই বিষয়ে ইবনু আব্বাসের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হলো:

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

"জেনে রাখো, যদি সমগ্র জাতি একত্রে কোনো বিষয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। আর তারা একত্রে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। ভাগ্যের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এর পৃষ্ঠাসমূহ শুষ্ক হয়ে গেছে"। হাসান সহীহ: সুনানে তিরমিয়ী হা/২৫১৬।

সালাফ ও পরবর্তী যুগের ইমামদের মত হলো: যেকোনো ব্যক্তি যদি এই বিষয়গুলোকে সন্দেহ ও সংশয় মুক্তভাবে দৃঢ়তার সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে বিশ্বাস করে, তাহলে সে অবশ্যই প্রকৃত মুমিন হবে। চাই তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস অকাট্য দলীলসমূহ হতে সৃষ্টি হোক অথবা কোনো দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হোক।

ইহসানের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, যেনো তুমি আল্লাহকে দেখছ"। এই বক্তব্যের সারমর্ম হলো ইবাদতসমূহ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সম্পন্ন করা, আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ করা ও তাঁর ব্যাপারে

গভীর মনোযোগী হওয়া, ইবাদত করা অবস্থায় তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব কল্পনা করা।

জীবরীল আলাইহিস সালাম এর বক্তব্য: "আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে সংবাদ দিন" এই বাক্যে أمارة শব্দটির প্রথম অক্ষর أ - এর ওপরে যবর হবে। আমারাহ শব্দের অর্থ হলো: নিদর্শন। আর أمة শব্দের অর্থ হলো: সন্তান জন্মদাত্রী দাসী। আর ربتها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: দাসীর মালিক। যা রব্ব শব্দের স্ত্রীবাচক। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: بعلها – অর্থাৎ দাসীর স্বামী। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: জনৈক বেদুইন ব্যক্তিকে তার নিকটে বিদ্যমান একটি উটনী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন: আমিই এর স্বামী (মালিক)। আর স্বামীকে আরবী ভাষায় بعل – বলার প্রচলন আছে। আর হাদীসে স্বামীকেই উক্ত দাসীর মালিক বলা হয়েছে। যেখানে رب শব্দটি স্ত্রীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "দাসী তার মালিককে জন্ম দিবে"। এই কথার ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন: এই কথার উদ্দেশ্য হলো মুসলিমগণ কাফেরদের রাষ্ট্র জয় করবে। যার ফলে দাসী গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে দাসীর মালিকের ঔরসজাত সন্তান তার পিতার মর্যাদার কারণে উক্ত দাসীর মালিক বলে বিবেচিত হবে। এই দৃষ্টিতে কিয়ামতের নিদর্শন হলো, মুশরিকদের ওপরে মুসলিমদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অত্যধিক পরিমাণে শহর বিজিত হওয়া এবং দাসী গ্রহণের বিষয়টি বৃদ্ধি পাবে।

কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো: মানুষের সামাজিক অবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি মালিকগণ তাদের সন্তানের জননীদের বিক্রি করে দিবে এবং ক্রেতাদের হাতে হাতে তারা বারবার হস্তান্তর হতে থাকবে। হয়তো কখনো তার কোনো এক সন্তান তাকে ক্রয় করবে, কিন্তু সেই সন্তান কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই মহিলা তারই মাতা। এই দৃষ্টিতে

কিয়ামতের নিদর্শন হলো: তাদেরকে বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মানুষের মাঝে অজ্ঞতার বিস্তার লাভ করা।

কেউ কেউ বলেছেন: এই বাক্যের অর্থ হলো: সন্তানদের মাঝে অধিক পরিমাণে অবাধ্যতার মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। যার ফলে সন্তান তার মাতার সাথে এমন আচরণ করবে, যেমন আচরণ মালিক তার দাসীর সঙ্গে করে। অর্থাৎ অপমান করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি। عالة — শব্দটির লাম তাশদীদ বিহীন উচ্চারিত হবে। যা বহুবচন হিসেবে ব্যবহার হয়। এক বচন হলো: عائل — শব্দটির অর্থ হলো: ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তি।

হাদীসে সুউচ্চ দালান-বাড়ি নির্মাণ এবং তা মজবুত করার ন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে অপছন্দ করার বর্ণনা পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب

“আদম সন্তানকে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়া হবে। তবে এই মাটিতে স্থাপনকৃত কোনো বস্তুর প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে না”। সহীহ: তিরমিযী হা/২৪৮৩।

আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পাথরের ওপরে আরেকটি পাথর এবং কোনো কাঁচা ইটের ওপরে আরেকটি কাঁচা ইট নির্মাণ না করেই মারা গেছেন। অর্থাৎ তিনি কখনোই নিজের ঘর মজবুতভাবে নির্মাণ করেননি। সেটাকে তিনি দীর্ঘও করেননি এবং কখনো সেটাকে সুসজ্জিত করেননি।

তাঁর বক্তব্য: رعاءالشاء — শব্দটিতে বকরীর রাখালদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য যে, তারাই হলো বেদুইনদের মাঝে সবচেয়ে দুর্বল সমাজ। এর অর্থ হলো, তারা তাদের দুর্বলতা এবং এই জাতীয় বিষয় (সুউচ্চ দালান নির্মাণ) এর উপকরণগুলো থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও এমন কাজ তারা করবে। পক্ষান্তরে উটের রাখালদের অবস্থা

সম্পূর্ণ এর বিপরীত। যেহেতু তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব ও দরিদ্র হয় না।

উমরের বক্তব্য: "আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করলাম"। এই বাক্যে لبثت শব্দটি تاء — অক্ষরসহ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু অবস্থান করলেন। আবার এই শব্দটি تاء — বিহীনও বর্ণিত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে এর অর্থ হবে: তিনি (জীবরীল) চলে যাওয়ার পরেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছেন। উভয় অর্থই সঠিক। আর مليا — শব্দটির ياء — অক্ষরে তাশদীদ হবে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময়। সময়টির পরিমাণ ছিল তিন। এভাবেই আবূ দাউদ ও অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য"। এর অর্থ হলো: তোমাদের দীনের মূলনীতি অথবা মৌলিক নিয়মসমূহ। শায়েখ মুহিউদ্দীন সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টি হলো ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের বর্ণনা। আর ঈমানের অপরিহার্যতা আল্লাহ তা'আলার অদৃষ্ট বা ভাগ্য সাব্যস্ত করার দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ইসলাম ও ঈমানের বর্ণনায় অনেক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এই বিষয়ে আলেমদের একাধিক মত রয়েছে। এগুলোর মাঝে অন্যতম হলো, যা ইমাম আবূল হুসাইন (যিনি ইবনু বাত্তাল মালিকী নামে পরিচিত) এর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আহলুস সুন্নাহ জামা'আতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মতানুসারে:

أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম, যা বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস হয়। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ

"তারা যেনো তাদের ঈমানের সাথে আরো অধিক পরিমাণ ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়"। সূরা আল ফাতাহ ৪৮:৪।

এই জাতীয় আরো একাধিক আয়াত রয়েছে। কোনো কোনো আলেমের মতানুসারে: মূল সত্যায়ন কখনো বৃদ্ধি হয় না এবং হ্রাস হয় না। তবে শারঈ ঈমানের মাঝে হ্রাস এবং অধিক সৃষ্টি হতে পারে মূল ঈমানের ফলাফল বৃদ্ধি পাওয়া এবং তা হ্রাস হওয়ার পরিণতিতে। আর সেই ফলাফল হলো 'আমল তথা কর্মসমূহ। তারা বলেন: এই মতের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি হয় মর্মে বর্ণিত বাহ্যিক দলীলের মাঝে এবং ঈমানের আভিধানিক মূল মর্মের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। এই মত, যা উক্ত আলেমগণ পোষণ করেছেন যদিও তা বাহ্যিক অর্থে স্পষ্ট, তবুও এর সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো — আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। সত্যায়ন বাহ্যিক দলীলগুলো অধিক পরিমাণে বিচার বিশ্লেষণ করার দ্বারা বৃদ্ধি হয়। এই জন্য সত্যায়নকারীদের ঈমান অন্যদের ঈমানের চাইতেও শক্তিশালী হয়। যেহেতু তাদেরকে কোনো ধরনের নির্বুদ্ধিতা ভ্রষ্ট করতে পারে না। তাদের ঈমান কোনো প্রকার বাঁধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকে। বরং তাদের অন্তরসমূহ সর্বদা উজ্জ্বল প্রফুল্ল থাকে, যদিও তাদের বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আর তারা ব্যতীত যেসকল লোকদের অন্তরে ঈমানের আগ্রহ অন্যকোনো মাধ্যম দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাদের অবস্থা প্রায় তাদেরই মতো, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। আবূ বকর সিদ্দিক — রদ্বীয়াল্লাহু আনহু — এর মূল সত্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে কখনো অস্বীকার করা যায় না এবং সন্দেহও করা যায় না যে, অন্য লোকদের সত্যায়নের একক পরিমাণ (পৃথক পৃথক ভাবে) তার (আবূ বকর) সত্যায়নের সমপরিমাণ

হবে না। এইজন্য বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে বলেছেন: ইবনু আবী মুলায়কাহ বলেছেন: আমি আল্লাহর রসূল — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — এর সাহাবীদের মাঝে এমন ত্রিশজন লোক পেয়েছি, যারা প্রত্যেকেই নিজেদের ওপরে নিফাক এর ভয় করতেন। তাদের মাঝে কেউ এমন কথা বলতেন না যে, আমার ঈমান জীবরীল ও মীকাইল — আলাইহিমাস সালাম — এর ঈমানের মতো। আর ঈমান শব্দটিকে আমলের ওপরে প্রয়োগ করার বিষয়টি আহলুল হক আলেমদের নিকট স্বীকৃত। এই বিষয়ে অগণিত দলীল বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"তিনি তোমাদের ঈমানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন না"। সূরা আল বাকারা ২:১৪৩। অর্থাৎ তোমাদের সালাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী:

"ইসলাম হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো হক মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল এই মর্মে তুমি সাক্ষ্য দিবে এবং তুমি সালাত কায়েম করবে" এই বাণী এবং ঈমানের ব্যাখ্যায় তাঁর থেকে বর্ণিত:

"আল্লাহ তা'আলার প্রতি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে" এই উভয় বাণীর বিশ্লেষণে শায়েখ আবূ আমর ইবনুস সালাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে: এটা হলো মূল ঈমান, যা অভ্যন্তরীণ সত্যায়ন। আর মূল ইসলামের বিবরণ, যার মূল মর্ম বাহ্যিক আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য। বাহ্যিকভাবে ইসলামের হুকুম দুই শাহাদাতের মাঝে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এর সঙ্গে সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যার কারণ হলো এগুলো ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। আর এগুলো কায়েম করার দ্বারাই কেবল তার আত্মসমর্পণ সহীহ হওয়া

সম্ভব। এরপরের বিষয়টি হলো ঈমান শব্দটি ঐ মর্মকেও শামিল করে, যা দ্বারা হাদীসে এবং আনুগত্যশীল ইবাদতের আলোচনায় ইসলামকে বুঝানো হয়। যেহেতু আনুগত্যশীল ইবাদতসমূহ অভ্যন্তরীণ সত্যায়নের ফলাফল, যা মূলত ঈমানের মানদণ্ড।

এই জন্যই শুধু আল মুমিন শব্দটি কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বা ফরয পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু কোনো বস্তুর নাম নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র উক্ত বস্তুর পূর্ণাঙ্গ সদস্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য। আর অসম্পূর্ণ সদস্যের ক্ষেত্রে তা একমাত্র নিয়্যাত বিহীন ব্যবহার হতে পারে না। একইভাবে এমন অপূর্ণাঙ্গ সদস্য থেকে ঈমান বিলুপ্ত হওয়ার মর্মও প্রয়োগ করা যায়। যেমন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"ব্যভিচারকারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মুমিন থাকে না"। সহীহ মুসলিম হা/৫৭।

ইসলাম শব্দটি মূল ঈমানকে শামিল করে, যেটাকে অভ্যন্তরীণ সত্যায়ন বলা হয় এবং আনুগত্যের মূল মানদণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, এগুলো সবই মূলত আত্মসমর্পণ। তিনি বলেন: সুতরাং আমাদের এই আলোচনা থেকে এটা নির্ণয় হলো যে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি একই অর্থে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। আর প্রত্যেক মুমিন মুসলিম, তবে প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়। তিনি বলেন: এই তাহক্বীকটি সামঞ্জস্য বিধান এবং ঈমান ও ইসলাম বিষয়ক কিতাব ও সুন্নাহ এর দলীলসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও এমন দলীলগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষকগণ ভুলের শিকার হয়ে থাকেন। আমরা এখানে যেই বিশ্লেষণ করলাম, তা অধিকাংশ আহলুল হাদীস ও অন্যান্য আলেমগণের মতের অনুকূল। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

أركان الإسلام

হাদীস — ৩: ইসলামের রূকনসমূহ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

আবু আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার ইবনে আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

“পাঁচটি ভিত্তির ওপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে— সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রমজানে সিয়াম পালন করা।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬।]

ব্যাখ্যা: আবূল আব্বাস কুরতূবী রহিমাহুল্লাহ বলেন: অর্থাৎ এই পাঁচটি বিষয় হলো দীন ইসলামের মূল ভিত্তি এবং মৌলিক নীতিসমূহের মানদণ্ড, যেগুলোর ওপরে ইসলামকে নির্মিত করা হয়েছে এবং এগুলোর দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়। জিহাদকে বাদ দিয়ে — যদিও এটা দীনকে উদীয়মান করে এবং কাফেরদের অহমিকা চূর্ণ করে দেয় — এই পাঁচটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য যে, এই পাঁচটি বিষয় হলো চলমান ফরয। আর জিহাদ হলো ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। আবার কখনো কখনো এটা চলমান থাকে না। এই হাদীসে কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে হজ্জকে সিয়াম এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যা রাবীর ভুল ধারণা। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। কারণ, ইবনু উমার যখন হাদীস পুনরাবৃত্তিকারীকে হজ্জকে সিয়ামের পূর্বে বর্ণনা করতে শুনলেন,

তখন তাকে শাসালেন এবং এই কাজটি করতে তাকে বারণ করলেন। সিয়ামকে তিনি হজ্জের পূর্বে রাখলেন। এরপরে বললেন: আমি এভাবেই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। ইবনু উমারের আরেকটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে:

"ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকল বাতিল মাবূদকে অস্বীকার করার দ্বারা, সালাত কায়েম করা।" অপর বর্ণনায়:

একজন ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে বলল: আমরা কি জিহাদ করবো না? তখন তিনি বললেন: আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

"ইসলামকে পাঁচটি ভিত্তির ওপরে নির্মাণ করা হয়েছে"। কোনো কোনো বর্ণনায় خمسة – শব্দ এসেছে। هاء – সহকারে। কোনো কোনো বর্ণনায় هاء – ব্যতীত। উভয়টিই সহীহ। এই হাদীসটি দীনের পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি মহা মূলনীতি। এই হাদীসের ওপরেই দীনের ভিত্তি স্থাপিত। যেহেতু এটা ইসলামের সকল রুকনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

الأعمال بخواتيمها

হাদীস – ৪: আমলসমূহের ফলাফল একমাত্র শেষ পরিণতি দ্বারা নির্ধারিত হয়

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم –وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ

يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ.

فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ .

আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত, আমাদেরকে বলেছেন:

তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর তার কাছে ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়- তার রিযিক, বয়স, আমল বা কর্ম এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান।

অতএব, আল্লাহর কসম-যিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ্ নেই- তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর মত কাজ করে- এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জাহান্নামবাসীর মত কাজ শুরু করে এবং তার ফলে তাতে প্রবেশ করে।

তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয়- এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জান্নাতবাসীদের মত কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [বুখারী: ৩২০৮, মুসলিম: ২৬৪৩।]

ব্যাখ্যা: সাহাবীর বক্তব্য: "তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত" অর্থাৎ তিনি তাঁর বক্তব্যের ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং তাঁর নিকট যেই মহান ঐশী বাণী আসে সেই বিষয়ে তিনি সত্যায়িত। অর্থাৎ অহীর দাবির ব্যাপারে তিনি সত্যায়িত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: "তোমাদের কোনো একজনের দেহ যখন তার মায়ের গর্ভে একত্রিত করা হয়" এই বাণীর অর্থ হলো: বীর্য জরায়ুতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এরপরে সেটাকে আল্লাহ তা'আলা এই সময়সীমার মাঝে তার মায়ের গর্ভাশয়ে একত্রিত করেন।

এই বিষয়ের ব্যাখ্যায় ইবনু মাসউদ রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: যখন বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ করে, এরপরে যদি আল্লাহ তা'আলা সেই বীর্য থেকে মানব সন্তান সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তাহলে তখন উক্ত বীর্য মহিলার জরায়ূ থেকে ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আবার জরায়ূতে ফিরে আসে। এরপরে এই অবস্থায় চল্লিশ রাত পর্যন্ত স্থির থাকে। এরপরে উক্ত শুক্রাণু রক্তে পরিণত হয়। এই (রক্তে পরিণত হওয়া) পরিস্থিতিটাই হলো একত্রকরণ। আর এই একত্রকরণের প্রকৃত সময় হলো রক্ত জমাট বাঁধার সময়।

তাঁর বক্তব্য: "এরপরে তার নিকট একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়" অর্থাৎ জরায়ুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। তাঁর বক্তব্য: "নিশ্চয় তোমাদের কোনো একজন জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে"। বাহ্যিক হাদীস মতে যদিও তার আমল সহীহ এবং সে তার আমলের কারণে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়েছে এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করতে আর মাত্র এক হাত পর্যন্ত দূরত্ব অবশিষ্ট রয়েছে। তথাপি তার জান্নাতে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে অদৃষ্টের পূর্ব লিখন, যা শেষ পর্যায়ে এসে প্রতীয়মান হয়েছে। **বিধায় আমল নির্ধারিত হয় পূর্ব থেকেই।** কিন্তু অদৃষ্টের পূর্ব লিখন আমাদের দৃষ্টিসীমার অগোচরে থাকায় এবং অদৃষ্টের শেষ পরিণতি আমাদের নিকট প্রকাশিত হওয়ায় হাদীসে বলা হয়েছে: "আমলসমূহের ফলাফল একমাত্র শেষ পরিণতি দ্বারা নির্ধারিত হয়"। অর্থাৎ ব্যক্তি পর্যায়ে এবং অবস্থাভেদে আমাদের নিকট শেষ পরিণতি

উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার কারণে (আমাদের নিকট) আমলসমূহের ফলাফল শেষ পরিণতি দ্বারা নির্ধারিত হয় এই কথা বলা হয়েছে। আর ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসনাদে ঈমান অধ্যায়ে যেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন:

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে অথচ সে জাহান্নামী"।

এই ব্যক্তির আমলই সহীহ নয়। বরং তার আমল ছিল লৌকিকতা ও সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই হাদীসটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমলসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং সেগুলোর দিকে আকৃষ্ট না হওয়া। বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

তাঁর বক্তব্য: "আর চারটি নির্দেশ লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়: তার রিযিক এবং মৃত্যুক্ষণ"। এখানে بكتب رزقه وأجله — বাক্যের শুরুতে باء — অক্ষর রয়েছে। এই অক্ষরটি সহকারে এই শব্দটি أربع كلمات — শব্দের বদল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাঁর বক্তব্য: شقي أوسعيد — শব্দটি মারফূ' হবে একটি উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে। উহ্য বাক্যটি এমন হবে: وهوشقي أوسعيد ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "শপথ ঐ মহান সত্তার! যিনি ব্যতীত অন্য কোনো হক মাবূদ নেই। তোমাদের কোনো একজন জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে .... এরপরে সে জাহান্নামবাসীর ন্যায় আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে"। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হলো: এটা খুব অল্প কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। আর এটা হয় একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার করুণা ও তাঁর রহমতের ব্যপ্তির কারণে। কারণ, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের পথে মানুষের স্থানান্তরিত হওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি। তবে সেই তুলনায়

কল্যাণ থেকে অকল্যাণের দিকে মানুষের স্থানান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্তই কম। এই বিষয়ে সকল প্রশংসা এবং কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য। আর এটা (তাঁর পক্ষ থেকে) ক্ষমা বলেই বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য: "নিশ্চয় আমার রহমত আমার রাগের ওপরে প্রাধান্য লাভ করেছে"। অপর বর্ণনানুযায়ী: "আমার রহমত আমার রাগকে পরাভূত করেছে"। এই হাদীসে আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেটা আহলুস সুন্নাহ জামাআতের মতাদর্শ। আর সমস্ত ঘটনার ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও তাকদীরের দ্বারাই সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ﴾

"তাঁকে তাঁর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে"। সূরা আল আম্বিয়া ২১:২৩।

তাঁর রাজ্যে তার সিদ্ধান্তে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ নেই। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে স্বীয় রাজ্যে যা ইচ্ছা, তাই করেন।

ইমাম সামআনী (মৃত ৫৬২ হি.) বলেছেন: এই বিষয় সম্পর্কে জানার একমাত্র রাস্তা হলো: শুধুমাত্র কিয়াস ও মানবীয় বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দিক নির্দশনা নেওয়া। যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করলো, সে পথভ্রষ্ট হলো এবং হতবুদ্ধিতার ফাঁদে ফেঁসে গেল। সে মানসিক সুস্থতার পথে উপনীত হতে পারবে না। মনের প্রশান্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। যেহেতু ভাগ্য আল্লাহ তা'আলার একটি গোপন বিষয়, যেটাকে তিনি গোপন রেখেছেন। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই সেই বিষয়টি জানেন। সৃষ্টিকুলের বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞানের আঁড়ালে রেখেছেন। আমাদের জন্য সেই স্থানেই স্থির থাকা ওয়াজিব, যেখানে তিনি আমাদের সীমা বেঁধে

দিয়েছেন। সুতরাং আমরা এই সীমানা অতিক্রম করবো না। আল্লাহ তা'আআলা সৃষ্টিজগৎ থেকে ভাগ্যের জ্ঞানকে আঁড়াল করে রেখেছেন। সুতরাং এটা কোনো ফেরেশতা ও প্রেরিত নবীও জানেন না।

কেউ কেউ বলেছেন: ভাগ্যের রহস্য তখনি তাদের সামনে উন্মোচিত হবে, যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পূর্বে তাদের সামনে সেটা উন্মোচিত হবে না। আর ভাগ্য বিষয়ক পূর্ববর্তী বক্তব্যের ভিত্তিতে আমল পরিত্যাগ করার ব্যাপারে হাদীসসমূহে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। বরং শরীআত কর্তৃক ধার্যকৃত বিষয়াদি মেনে চলা এবং সেগুলোর দায়িত্ব পূর্ণ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকেই আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসারে সহজেই কাজ করতে পারবে। তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোনো কাজ সে করতে পারবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সৌভাগ্যবানদের কাজ করা সহজ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি হতভাগা, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা হতভাগা লোকদের কাজ করা সহজ করে দিবেন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ﴾ ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ﴾

("সহজ পথকে আমরা তার জন্য সহজ করে দিব"), ("কঠিন পথকে আমরা তার জন্য সহজ করে দিব") । সূরা লাইল ৯২:৭ ও ১০।

আলেমগণ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তাঁর ফলক ও তাঁর কলম: এই সবগুলোর ওপরেই ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। আর এগুলোর অবস্থান ও আকৃতির জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটেই বিদ্যমান। তিনি বলেছেন:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ﴾

"তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বহির্ভূত কোনো বিষয়ের জ্ঞানই আয়ত্ব করতে পারে না" । সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫। আল্লাহই ভালো জানেন।

إبطال المنكرات والبدع

হাদীস – ৫: খারাপ কাজ ও বিদআত বাতিল বলে গণ্য হবে

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ. وفي رواية لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا ... فَهُوَ رَدٌّ.

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

যে আমাদের দীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে (অর্থাৎ তা গ্রহণ করা হবে না)। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।]

মুসলিমের বর্ণনায়, যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যাতে (কুরআন - সুন্নাহয়) কোনো নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত। নির্দশেনা

ব্যাখ্যা: অভিধান শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন: এখানে ردّ শব্দটি মূলত مردود – তথা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তাঁর বাণী: "যেই বিষয়ে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই" অর্থাৎ যেই বিষয়ে আমাদের কোনো আদেশ নেই। এই হাদীসটি দীনের একটি মহান মূলনীতি। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদানকৃত ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যগুলোর একটি। কারণ, এটা প্রতিটি বিদআত ও নব উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা। এর দ্বারা সকল নিষিদ্ধ চুক্তি বাতিল বলা এবং সেগুলোর ফলাফলের অকার্যকারিতার পক্ষে দলীল পেশ করা যায়। কোনো কোনো উসূলবিদ এর দ্বারা এই বিষয়ে দলীল পেশ করেন যে, নাহী (নিষেধাজ্ঞা) সে কাজটা বাতিল হওয়ার দাবি রাখে।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করলো, যেই বিষয়ে আমাদের কোনো আদেশ নেই, তাহলে তার কাজটি প্রত্যাখ্যাত হবে"।

এই বর্ণনাটি প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয় পরিত্যাগ করার ব্যাপারে স্পষ্ট একটি ঘোষণা। চাই, কর্তা নিজেই তা উদ্ভাবন করুক অথবা তার পূর্বে কেউ শুরু করুক। কারণ, কিছু অবাধ্য ব্যক্তি যখন বিদআত করে, তখন বলে: আমি নতুনরূপে কোনো কিছু উদ্ভাবন করিনি। এমন ব্যক্তির বিপক্ষে এই বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করা যায়।

এই হাদীসটি সংরক্ষণযোগ্য, প্রচারযোগ্য এবং সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ বিষয়াদি বাতিল সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। যেহেতু হাদীসটি এই সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সুন্নাহ বহির্ভূত নয় এমন মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করলে সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন: মহাগ্রন্থ আল কুরআন মুসহাফ বা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা। ঐ সকল মাযহাব, যেগুলো মুজতাহিদ ফকীহগণের নিকট উত্তম মনে হয়েছে, যেগুলোর শাখাগত মাসআলাসমূহকে তারা ঐ সকল মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন, যেগুলো আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা থেকে নির্গত। নাহু, গণিত ও ফারায়েয ইত্যাদি শাস্ত্র সম্পর্কে লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ। যেগুলোর মূল উৎস এবং ভিত্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য এবং তাঁর আদেশের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই শাস্ত্রীয় বিষয়াদি এই হাদীসের আওতাভুক্ত হবে না।

الحلال بيّن والحرام بيّن

হাদীস – ৬: হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ:

"إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقْد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ."

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

আবু আব্দিল্লাহ্ আন্-নু‘মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু‘য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে নিজের দীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে, সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি পশু) চরায়, আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, কোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।

সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান!

নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা হচ্ছে কলব (হৃদপিণ্ড)। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী: ৫২, মুসলিম: ১৫৯৯]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি শরীআতের অনেক বড় একটি মূলনীতি। আবূ দাউদ সিজিস্তানী বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি চারটি হাদীসের ওপরে নির্ভরশীল। উক্ত চারটির মাঝে তিনি এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আলেমগণ এই হাদীসটির সুমহান প্রেক্ষাপট ও প্রচুর ফায়দার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "নিশ্চয় হালাল অত্যন্ত স্পষ্ট। হারাম অত্যন্ত স্পষ্ট। আর উভয়টির মাঝে রয়েছে অনেকগুলো সন্দেহজনক বিষয়"। অর্থাৎ বিধানগত বিষয়াদি তিন প্রকারে বিভক্ত:

১ – আল্লাহ তা'আলা যেই বিষয়টিকে স্পষ্ট দলীলে হালাল বলেছেন, সেটা হালাল। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

"তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র খাদ্য হালাল করা হয়েছে এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"। সূরা আল মায়িদা ৫:৫। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

"তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পূর্বে বর্ণিত নারীদের ব্যতীত অন্য সকল নারীদেরকে"। সূরা আন নিসা ৪:২৪। ইত্যাদি।

২ – আল্লাহ তা'আলা যেই বিষয়টিকে স্পষ্ট দলীলে হারাম বলেছেন, সেটা স্পষ্ট হারাম। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

“তোমাদের জন্য (বিয়ে করা) হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃবর্গ এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদিগকে”। সূরা আন নিসা ৪:২৩। অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً

“তোমাদের জন্য স্থলচর প্রাণী শিকার করা হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে”। সূরা আল মায়িদা ৫:৯৬।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো: প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্ব প্রকার অশ্লীল কর্মসমূহ হারাম করা হয়েছে। আর প্রত্যেক এমন কর্ম, যেই কর্মে আল্লাহ তা‘আলা কোনো হদ্দ, অথবা শাস্তি অথবা ধমকি নির্ধারিত করে রেখেছেন, সেটা হারাম।

৩ – শুবুহাত (সন্দেহ, সংশয়) হলো প্রত্যেক এমন বিষয়, যা কিতাব ও সুন্নাহর দ্বন্দে এবং বিভিন্ন অর্থের পারস্পরিক আকর্ষণে আবদ্ধ। সুতরাং এমন বিষয় থেকে বিরত থাকাটাই তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা।

আলেমগণ মুশতাবিহাত সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন, যেগুলোর প্রতি এই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একদল আলেম বলেছেন: এগুলো হারাম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সে তার দীন ও মর্যাদা সহকারে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। তারা বলেছেন: এই বাক্যের অর্থ হলো: যে তার দীন ও সম্মানসহ নিষ্কৃতি না পেল, সে মূলত হারামে লিপ্ত হলো।

আরেকদল আলেম বলেছেন: এটা হাদীসে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ন্যায়: “ঐ রাখালের ন্যায়, যে চারণভূমির চারপাশে পশু চরায়”। সুতরাং এই বাক্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটা হালাল। আর এটা পরিত্যাগ করা পরহেযগারিতা।

আরেকদল আলেম বলেছেন: এই হাদীসে বর্ণিত মুশতাবিহাতকে আমরা হালালও বলব না এবং হারামও বলব না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে স্পষ্ট হালাল ও স্পষ্ট হারামের মাঝে স্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে এমন সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলোকে যেকোনো (হালাল বা হারাম) এক শ্রেণির সাথে নির্ধারিত করা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আর এটাও এক ধরনের ধার্মিকতা।

সহীহাইনে আয়িশা রদ্বীয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "একদা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবদ ইবনে যামআহ এক বালক সন্তানের ব্যাপারে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। সা'দ বললেন: হে আল্লাহর রসূল, এ হলো আমার ভাই উতবাহ বিন আবী ওয়াক্কাস এর সন্তান। সে আমার নিকট অঙ্গীকার করেছে যে, এটা তার সন্তান। আমি তার গঠন তার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করি। আর আবদ ইবনু যামআহ বললেন: হে আল্লাহর রসূল, এই সন্তানটি আমার ভাই। সে আমার পিতার শয্যায় তার স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে উতবাহ এর সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। এরপরে তিনি বললেন: "এই সন্তানটি তোমার অধিকারে হে আবদ ইবনু যামআহ। الولد للفراش وللعاهر الحجر – অর্থাৎ শয্যা যার, সন্তানও তার। আর ব্যভিচারীর জন্য শুধুমাত্র পাথর (রজম-পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা)। হে সাওদাহ, তুমি তার থেকে নিজেকে আঁড়াল করে রাখো"। সহীহ বুখারী হা/৬৭৪৯, সহীহ মুসলিম হা/১৪৫৭।

এরপর থেকে সাওদাহ আর কখনো তাকে দেখেননি। সুতরাং এই হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যার মালিককে সন্তানের অভিভাবকত্বের ফায়সালা করেছেন। ফলে সন্তানটি বাহ্যিকভাবে যামআহ এর দায়িত্বাধীন থাকবে। আর সে হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী সাওদাহ এর ভাই, যেহেতু তিনি যামআহ এর কন্যা ছিলেন। তবে এই ভ্রাতৃত্ব অত্যধিক সম্ভাবনার ভিত্তিতে, নিশ্চিতভাবে

নয়। এরপরে তিনি সাওদাকে তার থেকে আঁড়ালে থাকার আদেশ দিলেন যেহেতু উক্ত সন্তানের পিতৃত্বের সম্পর্ক সন্দেহপূর্ণ ছিল। তাই তিনি নিজের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করলেন। আর এটাই মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভীত ব্যক্তিদের আচরণ। কারণ, সন্তান যদি আল্লাহর ইলম অনুসারে যামআহ এর পুত্র হতোই, তাহলে তিনি কখনোই সাওদাকে পর্দার আদেশ দিতেন না। ঠিক যেভাবে তিনি সাওদার অন্যান্য ভাইদের থেকে তাকে আঁড়ালে থাকার আদেশ দেননি। যেমনঃ আবদ ও অন্যান্যরা।

আর আদী বিন হাতিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "হে আল্লাহর রসূল, আমি যখন শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর প্রেরণ করি, তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করি। তখন যদি আমি আমার কুকুরের সাথে অন্য আরেকটি কুকুরকে শিকারের ওপরে আক্রমণ করতে দেখি, তাহলে আমার করণীয় কী। তিনি বললেনঃ তুমি উক্ত শিকার ভক্ষণ করো না। কারণ, তুমি তোমার কুকুরের পক্ষে আল্লাহর নাম নিয়েছ, কিন্তু অপর কুকুরটির পক্ষে আল্লাহর নাম নাওনি"। সহীহ মুসলিম হা/১৯২৯।

এখানেও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংশয়ের ভিত্তিতেই এমন ফতোয়া দিলেন যে, হয়তো বা নাম নেওয়া হয়নি সেই কুকুরটিও শিকার করতে পারে। ফলে সে যেনো গায়রুল্লাহর নামে জবাই করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন প্রাণীকে ফিসক্ব তথা নিষিদ্ধ বলেছেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফতোয়া সমগ্রের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ বিদ্যমান থাকার ফলে হালাল ও হারামের সম্ভাবনাময় ঘটনা ও সমস্যাগুলোতে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এমন নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীতে প্রতীয়মান হয়ঃ

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

“তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এমন বিষয়কে পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয়কে গ্রহণ করো”। সহীহ: নাসাঈ হা/৫৭১১, তিরমিযী হা/২৫১৮।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: মুশতাবিহাত তিন প্রকারে বিভক্ত।

একটি হলো: এমন, মানুষ বিষয়টি হারাম জানার পরেও উক্ত বিষয়ে সে সন্দেহে পতিত হয় যে, বিষয়টির নিষিদ্ধতা কি আসলেই বিলুপ্ত হয়েছে নাকি এখনো অবশিষ্ট আছে? যেমন: জবাই করার পূর্বে মানুষের জন্য আহার করা হারাম এমন খাদ্য জবাই করা হয়েছে কি-না এই বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে উক্ত খাদ্যের নিষিদ্ধতা অবশিষ্ট থাকবে, যতক্ষণ না উক্ত বিষয়টি জবাই এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এই বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা যাবে। এই বিষয়ে আদী বর্ণিত হাদীসটি মূলনীতি বলে বিবেচিত।

এর বিপরীত হলো, কোনো খাদ্য মূলত হালাল হওয়া এবং পরবর্তীতে সেটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। যেমন: কোনো একজন ব্যক্তির একজন স্ত্রী রয়েছে। তার সন্দেহ হলো যে, সে হয়তো তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে। অথবা দাসীর মালিকের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো তাকে আযাদ করে দিয়েছে।

সুতরাং এই জাতীয় প্রকারের সন্দেহ মুবাহ বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না উক্ত বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা না যায়। এই বিষয়ের মূলনীতি পর্যায়ের হাদীস হলো আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের হাদীস। যা ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, পবিত্রতা অর্জন করেছে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরে সে নাপাক হয়েছে কি-না এই বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার: কোনো বিষয়ে এমন সন্দেহে পতিত হওয়া যে, উক্ত বিষয়টি কি হালাল নাকি হারাম সেই বিষয়ে জ্ঞান না থাকা। যখন বিষয়টিতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান থাকে। তবে কোনো একটির পক্ষে দলীল থাকে না। এমন ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কাজ হলো পরিহার করা।

যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরে পড়ে যাওয়া খেজুরের ব্যাপারে করেছিলেন, যখন তিনি খেজুরটি নিজ ঘরে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন:

لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِن الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

"যদি আমি খেজুরটি সাদাকার সম্পদ হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে খেয়ে ফেলতাম"। সহীহ বুখারী হা/২০৫৫।

আর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য দিকটির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটিকে ভিত্তিহীন কোনো কারণে বৈধতা দেওয়া হয়। যেমন: নিজস্ব গুণাবলির ওপরে প্রতিষ্ঠিত পানি এই আশঙ্কায় পরিত্যাগ করা যে, হয়তো বা এর মাঝে নাপাক পতিত হয়েছে। অথবা কোনো কিছুর চিহ্ন বিহীন স্থানে কোনো প্রাণীর পেশাব পড়ে শুকিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় সালাত পরিত্যাগ করা। অথবা কাপড়ে নাপাক লেগে থাকতে পারে – যদিও সেটা সে স্বচক্ষে দেখেনি – এই আশঙ্কায় কাপড় ধৌত করা ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিষয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কারণ, এমন সম্ভাবনার ভিত্তিতে পবিত্র বস্তুকে পরিহার করা পাগলামি। এমন বিষয় পরিহার করা নিঃসন্দেহে শয়ত্বানের ওয়াসওয়াসা। যেহেতু এখানে সন্দেহের কোনো উপযুক্ত কারণ নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যেই বিষয়গুলো অনেক মানুষ জানে না"। অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলোর হালাল-হারাম বিধান অনেকেই জানে না। অন্যথায় যে ব্যক্তি সংশয় সম্পর্কে জানতে পারবে, সে বুঝতে পারবে যে, এই বিষয়গুলো সম্ভাবনাময় বিভিন্ন বিধানের মাঝে (আংশিক হারে) বিদ্যমান থাকার কারণে কঠিন অস্পষ্টতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু যখনি এই সংশয়পূর্ণ বিষয় কোনো মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবে, তখনি সেটার সংশয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তখন হয়তো সেটা হালাল বা হারাম হবে। এখানে এই বিষয়ে একটি দলীল পাওয়া গেল যে, সংশয়পূর্ণ বিষয়ের একটি নিজস্ব বিধান রয়েছে, যেই বিষয়ে

শারঈ দলীল নির্দেশ করছে। যেখানে কিছু মানুষের জন্য পৌঁছানো সম্ভব।

তাঁর বাণী: "সুতরাং যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়াদি পরিত্যাগ করলো, সে তার দীন ও সম্মানসহ নিষ্কৃতি পেয়ে গেল"। অর্থাৎ সে সংশয়পূর্ণ বিষয়টি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। আর তাঁর অপর বাণী: "আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়াদিতে পতিত হলো, সে হারামে লিপ্ত হলো"। এটা দুইভাবে হতে পারে:

এক: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় না করে দুঃসাহসিকতার বলে সংশয়পূর্ণ বিষয়াদি পালন করবে, তাকে সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ কর্ম পর্যন্ত উপনীত করবে। উক্ত বিষয়ের শিথিলতা তাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার ন্যায় দুঃসাহসিকতার দিকে ধাবিত করবে। যেমন: তাদের অনেকেই বলেছেন: সগীরা গুনাহ কাবীরা গুনাহকে টেনে নিয়ে আসে। আর কাবীরা গুনাহ কুফরকে টেনে নিয়ে আসে। এক বর্ণনা অনুযায়ী: "গুনাহসমূহ হলো কুফরের দূত"।

দুই: যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হয়, তার অন্তর অন্ধকারে ঢেকে যায়, যেহেতু তার ইলমের নূর এবং ধার্মিকতার নূর বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে সে হারামে পতিত হয়েও বুঝতে পারে না। আবার কখনো সে হারাম কাজকে অবহেলা করে গুনাহগার হয়।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "ঐ রাখালের ন্যায়, যে চারণভূমির সীমানার চারপাশে পশু চরায়, যেকোনো সময় তার দ্বারা উক্ত সীমানা লংঘিত হওয়ার ভয় আছে"। এটা একটি দৃষ্টান্ত, যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ সীমা বুঝানোর জন্য উপস্থাপন করেছেন। মূল প্রবাদটির উৎপত্তিস্থল হলো, আরবদের একটি প্রচলিত নীতি থেকে। আরবরা তাদের গৃহপালিত পশুগুলোর চারণভূমির জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিত। উক্ত সীমানার নিকটে আগমনকারীর জন্য হুমকি ধমকির ঘোষণা দিয়ে রাখত। ফলে সুলতান (গোত্র প্রধান) এর শাস্তির ভয়ে যেকোনো ব্যক্তি তার

পালিত পশু নিয়ে সীমানা থেকে দূরে থাকত। যেহেতু সীমানার নিকটে থাকা ব্যক্তি যেকোনো সময় উক্ত ভূমিতে ঢুকে পড়বে এমন আশঙ্কা খুব বেশি। কারণ, কখনো কখনো কোনো বিচ্ছিন্ন বা একাকী অবস্থানকারী প্রাণী যদি উক্ত সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে তার পক্ষে সেই প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না। বিধায় সাবধানতা হলোঃ উক্ত সীমানার মাঝে আর রাখালের অবস্থানের মাঝে এতটুকু দূরত্ব বজায় রাখা, যাতে করে সে তাতে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার সীমানাও একই রকম। অর্থাৎ হত্যা, ব্যভিচার, সুদ, চুরি, মদ পান, মিথ্যা অপবাদ, গীবত, চোগলখুরি ইত্যাদি বিষয়েও একই সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। কারণ, এগুলোর নিকটে থাকলেও তাতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি। يوشك — শব্দটি أوشك — শব্দের মুদ্বারে' এর সীগা। যা باب إفعال — থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যা أفعال المقاربة — অন্তর্ভুক্ত। আর يرتع — শব্দটির تاء — অক্ষরটিতে যবর হবে। যার অর্থ হলোঃ চারণভূমি থেকে পশু-প্রাণীর খাদ্য আহরণ। এর মূল অর্থ হলোঃ পালিত পশুগুলোকে চারণভূমিতে চলাফেরা ও খাবার আহরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীঃ "জেনে রাখো, শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে। যদি সেটা ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ শরীর ঠিক হয়ে যাবে"। এখানে مضغة — শব্দটির অর্থ হলো গোশতের টুকরা। এর পরিমাণ হলো, একজন চর্বনকারী ব্যক্তি একবারে যতটুকু চাবাতে পারে ততটুকু। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো টুকরাটি আকারে ছোট হলেও এর গুরুত্ব অনেক বেশি। صلحت — শব্দটির لام — অক্ষরে আমরা যবর সহ বর্ণনা করেছি। قلب — মূলত মাছদার। যার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ এই অঙ্গটির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, এর মাঝে অতিদ্রুত বিভিন্ন ধারণা উদ্ভব হয় এবং সেগুলো বারংবার মনকে আন্দোলিত করতে থাকে।

কেউ কেউ এই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করে এই কবিতাটি রচনা করেছেন:

ماسمي القلب إلامن تقلبه * فاحذرعلى القلب من قلب وتحويل

"ক্বলবকে (অন্তর) একমাত্র তার অত্যধিক পরিবর্তনশীলতার কারণেই অন্তর বলা হয়। সুতরাং অন্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে সাবধান থাকো"।

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র প্রাণী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদেরকে এই বিশেষ অঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মাঝে উদ্দিষ্ট কল্যাণসমূহের ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ফলে তুমি দেখতে পাবে যে, প্রকার ভেদে চতুষ্পদ জন্তুগুলো তাদের সমূহ স্বার্থ উপলব্ধি করতে পারে। উক্ত ব্যবস্থাপনা দ্বারা তারা তাদের উপকার ও ক্ষতি অনুধাবন করতে পারে। এরপরে আল্লাহ তা'আলা এই পশুগুলোর মধ্য হতে মানবীয় শ্রেণিকে বিশেষভাবে বুদ্ধি দান করেছেন। এর পাশাপাশি এই শ্রেণির সদস্যদের দেহেও তিনি অন্তর সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ ﴾

"তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না। ভ্রমণ করলে তারা তাদের অন্তর দ্বারা অনুধাবন করতে পারত। অথবা তাদের কর্ণ দ্বারা শুনতে পারত"। সূরা আল হাজ্জ ২২:৪৬।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে তার অনুগত ও বশীভূত বানিয়েছেন। সুতরাং যার দেহে অন্তর স্থির থাকবে, তার অন্তর অন্যান্য অঙ্গগুলোর ওপরে বিজয় লাভ করবে এবং তার অন্তর অঙ্গগুলোকে নিজ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে পারবে। যদি সে ভালো পথে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে ভালো। আর যদি খারাপ পথে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে খারাপ।

যখন তুমি এই বিষয়টি বুঝতে পারবে, তখন তোমার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীটি স্পষ্ট হয়ে যাবে:

"জেনে রাখো, শরীরের মাঝে একটি গোশতের টুকরা আছে। যদি সেটা ভালো হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ শরীর ভালো হয়ে যায়। আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেই টুকরাটি হলো হৃদয় বা অন্তর"।

মহান আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরের সকল ত্রুটি সংশোধন করে দেন। হে অন্তরের সংস্কারক, আপনি আমাদের হৃদয়কে আপনার দীনের ওপরে অটল করে দিন। হে অন্তরের পরিচালক, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের প্রতি পরিচালিত করে দিন"।

الدين النصيحة

হাদীস – ৭: দীন হচ্ছে কল্যাণকামনা

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

আবু রুকাইয়্যা তামীম ইবনে আওস আদ্-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

দীন হচ্ছে কল্যাণকামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসকদের এবং সকল মুসলিমের জন্য। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/৫৫।]

ব্যাখ্যা: তামীম দারী রদ্বীয়াল্লাহু আনহুর একমাত্র এই হাদীসটি ব্যতীত আর কোনো হাদীস নেই। نصيحة – শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার অর্থ হলো: যাবতীয় কল্যাণের ইচ্ছা করা। যাকে সদুপদেশ দেওয়া হয় তার মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করা। শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত নাম বিশিষ্ট এবং সারাংশপূর্ণ প্রবাদ বচনমূলক শব্দ। আরবী ভাষায় এই শব্দের যথাযথ অর্থ ব্যক্ত করতে পারে এমন একক শব্দ নেই। যেমন: তারা فلاح – শব্দটির ক্ষেত্রে বলে: আরবী ভাষায় দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতের কল্যাণকে একত্রে অন্তর্ভুক্তকারী এই শব্দটির চেয়ে অধিক অর্থবোধক আর কোনো শব্দ নেই।

তাঁর বক্তব্য: "দীন একমাত্র নসীহত বা কল্যাণকামনার নাম"। এই কথার অর্থ হলো: দীনের ভিত্তি ও খুঁটি হলো: নসীহত। যেমন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

"হজ্জ একমাত্র 'আরাফাহ"। অর্থাৎ হজ্জের ভিত্তি ও খুঁটি হলো 'আরাফায় অবস্থান করা"। সহীহ: তিরিমিযী হা/৮৮৯।

আর নসীহত ও তার প্রকারসমূহের ব্যাখ্যায় খাত্তাবী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন:

ক. আল্লাহর জন্য কল্যাণকামনার অর্থ হলো

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন,

২. তাঁর থেকে অংশীদারত্বকে নাকচ করা,

৩. তাঁর যাবতীয় গুণাবলির কোনোটিই অস্বীকার না করা,

৪. তাঁর সকল পূর্ণাঙ্গ ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা তাঁর সত্তাকে গুণান্বিত করা।

৫. তাঁকে সকল প্রকার অপূর্ণাঙ্গ গুণাবলি থেকে মুক্ত ঘোষণা করা,

৬. তাঁর আনুগত্য বাস্তবায়ন করা এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করা।

৭. তাঁর জন্য একমাত্র ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁর জন্যই রাগ করা।

৮. তাঁকে অস্বীকারকারীর বিপক্ষে জিহাদ করা,

৯. তাঁর নিআমতকে স্বীকার করা এবং সেই নিআমতের শুকরীয়া আদায় করা।

১০. সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ নিয়্যাত করা।

১১. বর্ণিত সকল গুণাবলি বাস্তবায়নের প্রতি মানুষকে আহবান করা এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করতে প্রেরণা দেওয়া। মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার করা।

খাত্তাবী বলেছেন: এই গুণাবলির বাস্তবিক মর্ম মূলত নিজের কল্যাণের স্বার্থে বান্দার ওপরেই প্রযোজ্য হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনো সদুপদেশদাতার উপদেশ থেকে সম্পূর্ণ প্রয়োজনমুক্ত।

খ. মহান আল্লাহর কিতাবের জন্য নসীহত বা কল্যাণ কামনা বাস্তবায়িত হবে তাঁর কিতাবের ওপরে এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করার দ্বারা যে,

১. আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থ কোনো দিক থেকেই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

২. এমন কালাম রচনা করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. এরপরে এই মহাগ্রন্থকে সম্মান করা এবং এর হক আদায় করে তিলাওয়াত করা। সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা, তিলাওয়াতের সময় পূর্ণ মনোযোগ স্থাপন করা। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এর অক্ষরগুলোকে যথাযথরূপে উচ্চারণ করা এবং এর অর্থ বিকৃতিকারীদের বিকৃতি থেকে এটাকে হেফাযত করা।

৪. এর মাঝে বিদ্যমান প্রতিটি বিষয়কে সত্যায়ন করা। এর বিধানসমূহের পাশে বিরতি দেওয়া।

৫. এর সাথে সম্পৃক্ত শাস্ত্র ও দৃষ্টান্তগুলোকে সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করা।

৬. এর প্রেক্ষাপটগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৭. এর আশ্চর্যপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা।

৮. এর মুহকাম (স্পষ্ট) বিষয় অনুসারে আমল করা।

৯. এর মুতাশাবিহ (সন্দেহজনক) বিষয়ের প্রকৃত মর্ম আছে এবং সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এটা মেনে নেওয়া।

১০. এর আম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

১১. এই গ্রন্থের দাবির প্রতি মানুষকে আহবান করা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কল্যাণের দিকে মানুষকে আহবান করা।

গ. আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য কল্যাণ বা সদুপদেশ কামনা করা: এর অর্থ হলো

১. তাঁর রিসালাতের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর আনীত সকল বিষয়কে বিশ্বাস করা।

২. তাঁর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে আনুগত্য করা।

৩. তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে সাহায্য করা।

৪. তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করা।

৫. তাঁর পাওনা অধিকারকে সম্মান করা। তাঁকে শ্রদ্ধা করা।

৬. তাঁর পথ ও আদর্শকে জীবন্ত করে তোলা, তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া।

৭. তাঁর আদর্শের প্রচার এবং তাঁর আদর্শে আঘাতকারী অপবাদ প্রতিহত করা। তাঁর আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত শাস্ত্রসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া, সেগুলোর মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করা।

৮. সেই আদর্শের দিকে মানুষকে আহবান করা এবং তাঁর শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে বিনম্র আচরণ করা।

৯. তাঁর সুন্নাহকে সম্মান করা, যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং তা পাঠ করার সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা। না জেনে তাঁর সুন্নাহর ক্ষেত্রে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

১০. তাঁর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সম্মান করা, যেহেতু তারা তাঁর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

১১. তাঁর আচরণসমূহকে নিজের চরিত্রে বাস্তবায়ন করা। তাঁর শিষ্টাচারকে নিজের স্বভাবে পরিণত করা।

১২. তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে ও সাহাবীদেরকে ভালোবাসা। তাঁর আদর্শের মাঝে কোনো নতুন মত বা পথ উদ্ভাবনকারী অথবা তাঁর কোনো সাহাবীর ত্রুটি বর্ণনাকারী থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

ঘ. মুসলিম ইমামদের জন্য কল্যাণ বা সদুপদেশ কামনা করাঃ এর অর্থ হলো

১. তাদেরকে হকের ওপরে অবিচল থাকতে সাহায্য করা।

২. তাদের আনুগত্য করা এবং তাদেরকে হক মেনে চলতে আদেশ দেওয়া।

৩. তাদেরকে বিনয় ও নম্রতার সাথে সাবধান করা এবং স্মরণ করা।

৪. তাদেরকে গাফেল হয়ে যাওয়া বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

৫. তাদের নিকট সঠিক বার্তা পৌঁছানো এগুলো মুসলিমদের হক।

৬. এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা।

৭. মানুষের হৃদয়কে তাদের আনুগত্যের পক্ষে ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

৮. তাদের পেছনে সালাত আদায় করতে মানুষকে উৎসাহিত করা।

৯. তাদের সঙ্গে এক সারিতে যুদ্ধ করা।

১০. তাদের জন্য মঙ্গলের দুআ করা।

ঙ. সাধারণ মুসলিমদের জন্য – যারা শাসকবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয় – নসীহত বা কল্যাণ কামনা করা: এর অর্থ হলো

১. তাদেরকে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় স্বার্থ জড়িত এমন পথের দিশা দেওয়া। উক্ত বিষয়ে তাদেরকে সাহায্য করা।

২. তাদের ত্রুটিসমূহ গোপন করা এবং তাদের দোষসমূহ ঢেকে রাখা।

৩. তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং তাদের জন্য উপকার ও কল্যাণ সংঘটিত করা।

৪. তাদেরকে বিনম্রতা ও ইখলাসের সাথে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৫. তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো।

৬. তাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা এবং ছোটদেরকে স্নেহ করা।

৭. উত্তম উপদেশ দ্বারা তাদেরকে আপন করে নেওয়া।

৮. তাদের ধোঁকা ও হিংসার বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা।

৯. নিজের জন্য যেই বিষয়কে উত্তম মনে করা হয়, তাদের জন্য সেটাকে উত্তম মনে করা এবং নিজের জন্য অপছন্দনীয় বিষয়কে তাদের জন্যও অপছন্দ করা।

১০. তাদের সম্পদ ও ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা।

১১. এছাড়া তাদেরকে অন্যান্য সকল পরিস্থিতিতে কথা ও কাজের দ্বারা সাহায্য করা।

১২. তাদেরকে আমাদের উল্লিখিত সকল প্রকার নসীহত তথা কল্যাণময় গুণাবলি দ্বারা চরিত্র গঠনের প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নসীহত করা ফরযে কিফায়াহ। যদি যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ এই দায়িত্ব পালন করে, তাহলে অন্যান্যদের দায় থেকে এটা মুক্ত হয়ে যায়। এটা সামর্থ অনুযায়ী পালন করা আবশ্যক।

আভিধানিক অর্থে নসীহত হলো: ইখলাস তথা কোনো বস্তুকে কলুষমুক্ত করা, পরিষ্কার করা। বলা হয়: نصحت العسل – (আমি মধু পরিশোধন করেছি) এই বাক্যটি ঐ সময় বলা হয় যখন তুমি মধুর ময়লা পরিষ্কার করেছ। কেউ কেউ ভিন্ন অর্থের কথা বলেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

حرمة المسلم

হাদীস – ৮: মুসলিমের মর্যাদা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ .

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে, অবশ্য ইসলামের হক যদি তা দাবি করে তবে আলাদা কথা; আর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [বুখারী: ২৫, সহীহ মুসলিম: ২২।]

ব্যাখ্যা: এটি অনেক বড় একট হাদীস। দীনের একটি মহান মূলনীতি। এই হাদীসটি আনাস থেকেও বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

“যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও

রসূল, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের কিবলা অভিমূখী না হয়, আমাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত না খায়, আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় না করে। যখন তারা এটা করবে, আমাদের ওপরে তাদের রক্ত ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে উক্ত বিষয়গুলোর কোনো হকের মাঝে যদি তারা ত্রুটি করে থাকে, তাহলে সেটার ভিত্তিতে বিচার হবে। মুসলিমদের সকল অধিকার তারা পাবে। আর মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে”। সহীহ: তিরমিযী হা/২৬০৮, আবূ দাউদ হা/২৬৪১।

আর সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে:

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই মর্মে সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো হক মাবূদ নেই এবং আমার আনীত দীনের প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে”। সহীহ মুসলিম হা/২১। এই বর্ণনাটি ইবনু উমরের বর্ণনার সাথে মর্মগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই হাদীসের বাস্তবিক প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন: যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর পরে আবূ বকর সিদ্দীক রদ্বীয়াল্লাহু আনহু খলীফা হলেন। আর আরবদের মাঝে অনেকেই কুফরী করলো। তখন আবূ বকর রদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করলেন।

তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও ছিল, যারা শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কিন্তু কুফর করেনি। বরং এমন বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন: আপনি এমন একদল মানুষের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি দেয়। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে,

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই কথার স্বীকৃতি না দেয়”। তখন আবু বকর সিদ্দীক রদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহর কসম, যদি তারা আমাকে একটি বাচ্চা বকরী দিতেও অস্বীকার করে — অপর বর্ণনায়: একটি রশি দিতে অস্বীকার করে — যা তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আদায় করত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। তখন উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু যাকাত আদায় অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে সহমত হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্য: “আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই কথা স্বীকার না করবে। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি দিল, সে আমার নিকট থেকে তার সম্পদ ও তার জীবন নিরাপদ করে নিল। তবে এই দুইটির কোনো হক পূর্ণ না করলে সেই অনুসারে তার বিচার হবে। আর উক্ত হকের ব্যাপারে অসম্পূর্ণতার জন্য সে আল্লাহর নিকট তাকে হিসাব দিতে হবে”।

খাত্তাবী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: এখানে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরবের মুশরিক ও মূর্তিপূজারী এবং অবিশ্বাসী লোকগণ। আহলুল কিতাব তাওহীদ স্বীকারকারী সম্প্রদায় এর বিষয়টি ব্যতিক্রম। সুতরাং কুফর করা অবস্থায় যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি দেয় এবং এই কালিমা তার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। একইভাবে অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই সাক্ষ্য না দেয় যে, আমি আল্লাহর রসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা না করে এবং যাকাত আদায় না করে”।

শায়েখ মুহীউদ্দীন নববী বলেছেন: এর পাশাপাশি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত পূর্ণাঙ্গ দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরূরী। যেমনটি আবূ হুরায়রার অপর বর্ণনায় এসেছে: “যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো হক মাবূদ নেই এই কথার সাক্ষ্য না দেয় এবং আমার প্রতি এবং আমার আনীত দীনের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন না করে”। “আল্লাহর নিকট তাদেরকে হিসাব দিতে হবে” এই বাক্যের অর্থ: অর্থাৎ লোকচক্ষুর আঁড়ালে তারা যা করে এমন বিষয়ে। এখানে প্রকাশ্যে ওয়াজিব পর্যায়ের বিধানসমূহ পালনে তাদের দ্বারা সংঘটিত ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে না।

তিনি বলেছেন: এই বাক্য থেকে এটা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম মানলেও গোপনে কুফর লালন করে, বাহ্যিক প্রেক্ষাপটে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে। এটা অধিকাংশ আলেমগণের মত। ইমাম মালেকের মতে, যিনদীকের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমাদ থেকেও এমন মত বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: “আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো হক মাবূদ নেই এই কথার সাক্ষ্য না দেয় এবং আমার প্রতি এবং আমার আনীত দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে”। এই বক্তব্যের মাঝে সালাফ ও পরবর্তী মুহাককিক অধিকাংশ আলেমের মতের পক্ষে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মতটি হলো: যখন কোনো মানুষ দীন ইসলামকে সংশয়ের উর্ধ্বে উঠে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে, তখন এই বিশ্বাসই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তার জন্য মুতাকাল্লিমগণের দলীলসমূহ জানা এবং সেগুলোর দ্বারা আল্লাহর পরিচয় জানা জরূরী নয়। পক্ষান্তরে আরেক দল আলেমের মতে, মুতাকাল্লিমগণের দলীল সম্পর্কে জানা ওয়াজিব এবং তারা এটাকে একই কিবলার অভিমূখী মুসলিমদের জন্য শর্ত বলেছেন। আর এটা স্পষ্ট একটি ভুল ধারণা। কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হলো দৃঢ়চিত্ত সত্যায়ন। আর সেটা অর্জিত হয়েছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আনীত দীনের সত্যায়ন পর্যন্তই কথার ইতি টেনেছেন। এরপরে দলীল জানার কোনো শর্ত তিনি আরোপ করেননি। সহীহ গ্রন্থগুলোতে এই মর্মে অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান, যেগুলোকে একত্রিত করার দ্বারা মূল অর্থের মাঝে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা ও তথ্যগত অকাট্যতা সাব্যস্ত হয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

التكليف بما يستطاع

হাদীস – ৯: সক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

আবু হুরায়রা আব্দুর রহমান ইবনে সাখর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো। আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। বেশি বেশি প্রশ্ন করা, আর নবীদের সাথে মতবিরোধ করা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী: ৭২৮৮, সহীহ মুসলিম: ১৩৩৭]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটির শব্দ সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন:

একদা আমাদেরকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: "হে লোকসকল, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ করো। তখন একজন বলল: হে আল্লাহর রসূল, প্রত্যেক বছরেই কি করতে হবে? তখন তিনি চুপ করে থাকলেন। এই কথা সেই লোকটি তিনবার বলল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; যদি আমি হ্যাঁ বলে দিতাম, তাহলে হজ্জ প্রত্যেক বছর পালন করা তোমাদের ওপরে ফরয হয়ে যেতো। কিন্তু তোমরা সেটা করতে পারতে না। এরপরে বললেন:

আমি তোমাদেরকে যা বলিনি এমন বিষয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে তাদের অধিক প্রশ্ন এবং তাদের নবীগণের ব্যাপারে মতানৈক্যই ধ্বংস করেছে। তাই যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয় পালনের আদেশ দেই, তখন তা সাধ্য অনুযায়ী পালন কর। আর যখন কোনো বিষয়ে তোমাদেরকে বারণ করি, তখন সেটা পরিত্যাগ করো"। এই হাদীসের প্রশ্নকারী হলেন: আকরা বিন হাবিস। যেমনটি অন্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উসূল শাস্ত্রবিদগণ এই বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন যে, আমর (আদেশ) কি বারংবারতার দাবি রাখে? অধিকাংশ ফকীহ ও মুতাকাল্লিমের মতে, আমর বারংবারতার দাবি রাখে না। অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: বারংবারতার দাবির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। বরং একাধিকবারের ক্ষেত্রে একমাত্র দলীলের ওপর নির্ভর করতে হবে। যারা দলীল বহির্ভূত সিদ্ধান্ত না দিয়ে নীরব থাকা এর পক্ষে তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। কারণ, প্রশ্নকারী বলেছেন: প্রত্যেক বছর হজ্জ করতে হবে কি-না? যদি নির্দেশের সাধারণ প্রয়োগ বারংবারতার পক্ষে অথবা বিপক্ষের কোনো মর্ম নেই। যদি তা থাকত, তাহলে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলতেন না: "যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে সেটাই ওয়াজিব হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না"। বরং প্রশ্নেরও কোনো প্রয়োজন হতো না। বরং সাধারণ আমর এমন সাধারণ মর্মের জন্যই প্রযোজ্য হবে। সমগ্র উম্মাহ শরীআতের মূলনীতির ভিত্তিতে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হজ্জ সম্পূর্ণ জীবনে মাত্র একবার পালন করা ওয়াজিব। আর তাঁর বক্তব্য: "আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি এমন বিষয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও"। এই বক্তব্যটি "আমর (আদেশ) বারংবারতার দাবি রাখে না" এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়।

এই শব্দটি এই বিষয়ের ওপরেও ইঙ্গিত করে যে, (নির্দেশের ক্ষেত্রে) মূল মর্ম হলো ওয়াজিব বা আবশ্যক না হওয়া। আর শরীআত এর বিধান আসার পূর্বে কোনো বিধান ধর্তব্য হবে না। এই মতটি অনেক

উসূলবিদের নিকট সহীহ। আর তাঁর বক্তব্য: “যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে সেটা ওয়াজিব হয়ে যেত” এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বিধি-বিধানের মাঝে ইজতিহাদ করার অধিকার আছে এই বিষয়ক সহীহ মতের স্বপক্ষে একটি দলীল। আর তাঁর সিদ্ধান্ত একমাত্র অহী দ্বারা সাব্যস্ত হওয়াটা শর্ত নয়।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “আমি তোমাদেরকে যেই বিষয় পালনের নির্দেশ দেই, তা সাধ্যমত তোমরা পালন করো” এটা ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদানকৃত ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যগুলোর একটি। এর মাঝে অগণিত বিধান অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন: সালাত। যদি কোনো ব্যক্তি এর কোনো রুকন আদায়ে সক্ষম না হয় অথবা এর কিছু শর্ত পালন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে অবশিষ্ট রুকন বা শর্তগুলো পালন করবে। আর যদি সে ওযূর কোনো অঙ্গ ধৌত করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ধৌত করা সম্ভব এমন অঙ্গসমূহ ধৌত করবে। এই জাতীয় বিষয়ের সংখ্যা অগণিত। এটা ফিকহের কিতাবগুলোতে প্রসিদ্ধ একটি মূলনীতি। এই হাদীসটি আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর ন্যায়:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾

“তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করো”। সূরা তাগাবুন ৬৪:১৬। আর আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো। আর তাঁর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ না করে মৃত্যুবরণ করো না”। সূরা আলে ইমরান ৩:১০২।

এই আয়াতের ক্ষেত্রে বলা হয়, তা রহিত হয়েছে এই আয়াতের দ্বারা:

“তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে সাধ্য অনুযায়ী ভয় করো”। কেউ কেউ বলেছেন: সহীহ মত হলো: এই আয়াতটি আসলে পরবর্তী আয়াতটি দ্বারা রহিত হয়নি। বরং পরবর্তী আয়াতটি পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যাকারী। পূর্বের আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী। তারা বলেছেন: যথাযথ ভয় করা এর অর্থ হলো: তাঁর আদেশসমূহ পালন করা। তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিত্যাগ করা। আর মহান আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র সাধ্যের সীমা পর্যন্তই মানার আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু তিনি বলেছেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾

“আল্লাহ তা‘আলা কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্য বহির্ভূত আদেশ পালনের দায়ভার প্রদান করেন না”। সূরা আল বাকারা ২:২৮৬। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾

“তিনি দীনের মাঝে তোমাদের জন্য কোনো কষ্টকর বিধান ধার্য করেননি”। সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৮।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: “যেই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করবো, তা তোমরা পরিহার করবে”। এই বাণিটি তার সাধারণ অর্থ অনুসারে প্রয়োগ হবে। কিন্তু কখনো সেই নিষেধাজ্ঞাকে বৈধকারী কোনো অজুহাত পাওয়া গেলে উক্ত অবস্থায় সেই অজুহাত সেটাকে বৈধ সাব্যস্ত করবে। যেমন: নিরূপায় অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া ইত্যাদি। তাহলে এমন উক্ত কাজটি নিষিদ্ধ বিবেচিত হবে না।

তবে অজুহাত বিহীন অবস্থায় এমন কাজ করাটা নিষেধাজ্ঞার দাবিকে অমান্য করা হবে। ফলে এমন অবস্থায় সকল প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম

পরিত্যাগ করতে হবে। একটি মাত্র (নিষিদ্ধ কাজ) কাজ করার দ্বারাও সে নিষেধাজ্ঞার দায় থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে নির্দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এই মূলনীতিটা যখন বুঝা সম্ভব হবে, তখন সাধারণ নির্দেশের এই মাসআলাও বুঝে আসবে: আমরকে কি তাৎক্ষণিক পালন করা জরূরী নাকি বিলম্বে পালন করা যাবে? অথবা আমর একবারের প্রতি নির্দেশ করে নাকি বারংবারতার প্রতি নির্দেশ করে? সুতরাং এই হাদীসটিতে ফিকহের অনেকগুলো অধ্যায় জড়িত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তাঁর বক্তব্য: "কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একমাত্র তাদের অধিক প্রশ্ন করার প্রবণতা এবং তাদের নবীগণের ব্যাপারে তাদের অধিক মতানৈক্য ধ্বংস করে দিয়েছে"। এই বক্তব্যটি "আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি এমন বিষয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও" এই কথার পরে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন: তোমরা অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করো না। তাহলে কখনো এর বিপরীতে অধিক পরিমাণে উত্তর আসবে। ফলে সেটা বনী ইসরাঈলের ঐ ঘটনার আকার ধারণ করবে, যেখানে তাদেরকে বলা হলো:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা গাভী জবাই করো"। সূরা আল বাকারা ২:৬৭।

কারণ, তারা যদি শুধুমাত্র গাভী শব্দটির ওপরে ক্ষান্ত হয়ে যেকোনো গাভী জবাই করত, তাহলে সেটা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা যখন অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করতে লাগল এবং সহজ বিষয়টিকে আরো কঠিন বানিয়ে নিল, তখন তাদের জন্যও বিষয়টিকে কঠিন করে দেওয়া হলো এবং এই বিষয়ে তারা তিরস্কৃত হলো। আর এই বিষয়টিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের ক্ষেত্রে ঘটার আশঙ্কা করেছিলেন।

الاقتصار على الحلال الطيب

হাদীস – ১০: পবিত্র হালাল বস্তুর ওপর সীমাবদ্ধ থাকা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আল্লাহ তা‘আলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের ঐ কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: (হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন।) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন: (হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর।)

তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়েছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে: হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-

পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দুআ কবুল হতে পারে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/১০১৫]

ব্যাখ্যা: বলা হয়: طيب — শব্দটি আল্লাহর গুণাবলিতে সকল প্রকার ক্রটি থেকে পবিত্র হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। এই হাদীসটি ঐ সকল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ওপরে ইসলামের নীতিমালা এবং বিধি-বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে হালাল পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পদ থেকে দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পদ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও এই জাতীয় বস্তু নিশ্চিত খাঁটি হালাল হওয়া উচিত।

আর যে দুআ করতে চায়, তার জন্য অন্যান্য বিষয় থেকে হালালের ব্যাপারে অধিক সচেতন থাকা উচিত। এই হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, যখন কোনো বান্দা তার সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করে, তখন সেটাই খাঁটি হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। আর অবৈধ সুস্বাদু খাবার খাদকের ওপরে বিপদ হয়ে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির আমল গ্রহণ করেন না।

রাবীর বক্তব্য: "এরপরে তিনি এমন ব্যক্তির কথা বললেন, যে দীর্ঘ সফর করে ধুলায় ধূসরিত ক্লান্ত অবস্থায়"। এর অর্থ হলো — আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন — আনুগত্যমূলক ইবাদত পালনের পথে সেই ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছেন। যেমন: হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি নেক কাজসমূহ। কিন্তু এরপরেও তার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম। অবস্থা এমন হলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কত বিভীষিকাময়, যে দুনিয়ার পেছনে বিভোর হয়ে আছে অথবা বান্দাদের প্রতি অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত অথবা ইবাদত ও নেক কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে আছে?

তাঁর বক্তব্য: "সে তার দুই হাতকে প্রসারিত করে"। অর্থাৎ সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা ও অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তার দুই হাতকে আল্লাহর নিকট দুআর জন্য ওপরে উঠায়। তাঁর বক্তব্য: "হারাম খাবার দ্বারা পেট

পূর্ণ করেছে"। এখানে غين – অক্ষরে পেশ হবে। আর ذال – অক্ষরে যের হবে সুকূনের সাথে। তাঁর বক্তব্য: তাহলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে" অর্থাৎ যার অবস্থা এমন, তার দুআ কোথা থেকে কবুল হবে। কারণ, সে তার আহবানে সাড়া পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে এটা সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিবেন অনুগ্রহ, দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

التورع عن الشبهات

হাদীস – ১১: সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করা

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "دَعْ مَا يُرِيبُك إلَى مَا لَا يُرِيبُك." رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ কথা শুনে স্মরণ রেখেছি: সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।" সুনানে তিরমিয়ী ও সুনানে নাসাঈতে হাদীসটি উল্লেখিত। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। [সহীহ: তিরমিযী হা/ ২৫১৮, নাসায়ী হা/৫৭১১।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: يريبك – শব্দটিতে (যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে) ياء – অক্ষরে যবর ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। তবে যবরটিই

অধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ। আর পেশও এখানে জায়েয আছে। আরবীতে বলা হয়: رابني الشئ وأرابني হাদীসের বাক্যটির অর্থ হলো: যেই বিষয়ে তুমি সন্দেহে পতিত হয়েছ, তা পরিহার করো।

আর যেই বিষয়ে তুমি কোনো সন্দেহে পতিত হওনি, সেই বিষয়ের প্রতি ধাবিত হও। এটা ষষ্ঠ হাদীসের অর্থের ন্যায়। যেখানে বলা হয়েছে: "নিশ্চয় হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর উভয়টির মাঝে সন্দেহমূলক অনেক বিষয় রয়েছে।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয় বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপত্তিকর বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় আপত্তিহীন বিষয় পরিত্যাগ না করবে"। এই স্তরটা ঐ স্তরের চাইতেও উর্ধ্বের স্তরে।

ترك ما لا يعني المسلم

হাদীস – ১২: অনর্থক বিষয় পরিহার করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم": مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ." حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، ابن ماجه.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম হলো অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা।" হাদীসটি হাসান। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহতে বর্ণিত।

[হাদীসটি হাসান। তিরমিযী, হা/২৩১৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৭৬।]

ব্যাখ্যা: হাদীসটি কুররা বিন আব্দুর রহমান যুহরী থেকে, তিনি আবূ সালামাহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। এই

হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। এরপরে এই হাদীসের ব্যাপারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন: এটা অল্প শব্দে বহুল অর্থ বিশিষ্ট বাক্যগুলোর একটি। এর দৃষ্টান্ত হলো কোনো কোনো হাদীসে আবূ যরের এই মন্তব্য: "যে ব্যক্তি নিজের কথাকে আমল হিসাবে গণ্য করবে, তার অনর্থক কথার পরিমাণ কমে যাবে"।

ইমাম মালেক উল্লেখ করেছেন যে, তার নিকট লুকমান হাকীমের ব্যাপারে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, একদা তাকে বলা হলো: আমরা আপনাকে যেই স্তরে আজ দেখছি, সেখানে আপনি কোন শক্তির বলে পৌঁছেছেন – তারা এর দ্বারা মূলত তার সম্মানের স্তরকে উদ্দেশ্য করেছে? তখন তিনি বললেন: সত্য কথা, আমানত যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং অনর্থক কথা পরিহার করা।

হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: কোনো বান্দার থেকে আল্লাহ তা'আলার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটি অন্যতম নিদর্শন হলো, তাকে অনর্থক কাজে লিপ্ত করে দেওয়া। তিনি বলেন: আবূ দাউদ বলেছেন: প্রত্যেক শাস্ত্রে সুন্নাহর মূলনীতি হিসেবে চারটি হাদীস বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে এই হাদীসটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন।

كمال الإيمان

হাদীস – ১৩: ঈমানের পরিপূর্ণতা

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

আবু হামযাহ আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম-হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [**সহীহ বুখারী, হা/১৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫**।]

ব্যাখ্যা: এভাবেই সহীহ বুখারীতে لأخيه – “তার ভাইয়ের জন্য” শব্দটি সহকারে কোনো প্রকার সংশয় বিহীন বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে “যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য – অথবা তার প্রতিবেশীর জন্য – পছন্দ করবে”। যা সংশয়ের সাথে বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ বলেছেন: অর্থাৎ সে পূর্ণরূপে ঈমান আনতে পারবে না। অন্যথায় মূল ঈমান ঐ ব্যক্তির জন্যও সাব্যস্ত হয়, যে এই গুণের অধিকারী নয়। এই কথার উদ্দেশ্য হলো: সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ সকল আনুগত্যমূলক ইবাদত এবং বৈধ বিষয়সমূহ পছন্দ করবে। এই বিষয়ের প্রতি নাসায়ীর বর্ণনাটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে: “যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ নেক কাজ পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে”।

শায়খ আবূ ‘আমর ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটাকে কখনো কখনো অত্যন্ত কঠিন ও অসম্ভব মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। যেহেতু এর অর্থ হলো: তোমাদের কারোর ঈমান পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের দীনী ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর এটাকে এইভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যে, তার দীনী ভাইয়ের জন্যও সে একই বিষয়টি অর্জিত হওয়াকে পছন্দ করবে এমনভাবে যে, উক্ত বিষয়ে সে তার সাথে কোনো প্রকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না। যাতে করে কোনো প্রকার নিআমতের ঘাটতি তার দীনী ভাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা না দেয়। এটা সুস্থ হৃদয়ের জন্য

সহজসাধ্য বিষয়। এটা একমাত্র ত্রুটিপূর্ণ হৃদয়ের মানুষের জন্যই কঠিন হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আমাদের সকল ভাইদেরকে নিরাপদ রাখুন।

আবুয যিনাদ বলেছেন: এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে সমান স্তরের ভালোবাসার দাবি বুঝা যায়। তবে বাস্তবিক অর্থে হাদীসের দাবি হলো অপর ভাইকে নিজের চাইতে অধিক ভালোবাসা। কারণ, মানুষ সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে চায়। সুতরাং সে তার ভাইয়ের জন্যও যখন এটা পছন্দ করতে শুরু করবে, তখন থেকেই সে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তার ভাইয়ের চাইতে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। তুমি কি দেখো না যে, মানুষ তার অধিকার ও তার সাথে কৃত অন্যায়ের ব্যাপারে ন্যায় বিচার চায়?

সুতরাং সে যদি নিজের ঈমানকে পূর্ণ করে, আর তার নিকট তার ভাইয়ের কোনো পাওনা বা অন্যায়ে দায়বদ্ধ থাকে, তাহলে সে নিজের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ ইনসাফের ভিত্তিতে তা আদায় করবে। যদিও সেটা তার জন্য কষ্টকর হয়।

বর্ণিত হয়েছে যে, ফুযাইল বিন'আয়ায সুফয়ান বিন 'উয়াইনাকে বলল: যদি তুমি এটা চাও যে, মানুষ তোমার মতো হয়ে যাক, তাহলে তুমি নিজের ব্যাপারে বিচার করে দেখ যে, মহান আল্লাহর নসীহত কতটুকু যথাযথভাবে তুমি পালন করেছ। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব, যা তুমি কামনা করছ অথচ তারা তোমার চাইতেও নিম্নস্তরের ঈমানদার?

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এই হাদীসে এই সূক্ষ্ম কথাটি লক্ষ্য করা যায় যে, একজন মুমিন অপর মুমিনের ক্ষেত্রে একই সত্তার ন্যায়। সুতরাং সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত। যেহেতু তারা উভয়েই এক সত্তা। যেমনটি অপর হাদীসে এসেছে:

"المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"

“মুমিনগণ একই দেহের ন্যায়। যখন দেহের একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার জন্য দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ একত্রে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় ভুগতে থাকে”। সহীহ মুসলিম হা/২৫৮৬।

حرمة دم المسلم وأسباب إهداره

হাদীস – ১৪: মুসলিমের রক্তের মর্যাদা ও তা নষ্টের কারণ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَمُسْلِمٌ.

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“কোনো মুসলিমের রক্তপাত করা তিনটি কারণ ব্যতীত বৈধ নয়। ১. বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, ২. যদি হত্যার বদলে হত্যা করতে হয়। ৩. যদি কেউ স্বীয় দীন পরিত্যাগ করে মুসলিম জামাআত হতে পৃথক হয়ে যায়।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/১৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫।]

ব্যাখ্যা: কোনো কোনো মুত্তাফাক্ব আলাইহি বর্ণনায় এসেছে: “আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদানকারী কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্ত তিনটি কারণের কোনো একটি কারণ ব্যতীত বৈধ হবে না”। সুতরাং তাঁর বক্তব্য: “আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল এই মর্মে যে সাক্ষ্য

প্রদান করে” যেনো এটা “কোনো মুসলিম ব্যক্তি” শব্দের ব্যাখ্যা। একইভাবে “জামাআত পরিত্যাগকারী” কথাটি যেনো “নিজের দীনকে পরিত্যাগকারী” বাক্যের ব্যাখ্যা। আর উক্ত তিনজন ব্যক্তির রক্ত বৈধ। অর্থাৎ দলীলের দ্বারা তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। আর জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মুসলিম সমাজ। আর তাদের বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত হয়েছে দীন পরিত্যাগ করার দ্বারা। আর এটাই তার রক্ত বৈধ হওয়ার একমাত্র কারণ।

তাঁর বক্তব্য: “জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ দীন পরিত্যাগ করা” কথাটি ইসলাম পরিত্যাগকারী প্রতিটি মুরতাদ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চাই সেটা যেকোনো প্রকার ধর্মান্তরের দ্বারাই হোক না কেনো। ফলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে, যদি ইসলামের পথে ফিরে না আসে।

আলেমগণ বলেছেন: একইভাবে এই কথাটি বিদআত অথবা রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা উভয়টির দ্বারা জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিটি ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বাহ্যিকভাবে এই দলীলটি আম (ব্যাপক) হলেও আমরা এই দলীল থেকে আক্রমণকারী ও এই জাতীয় ব্যক্তিকে এই হুকুমের আওতা বহির্ভূত বিবেচনা করবো। এমন ব্যক্তির বিপদ থেকে বাঁচার স্বার্থে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। আবার কখনো এই দাবির উত্তরে বলা হয়: এমন ব্যক্তি “জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির” এই কথার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তখন কথাটির উদ্দেশ্য হবে: এমন ব্যক্তিকে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করা জায়েয নয়। তবে উক্ত তিনজন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হলে তখনই কেবল জায়েয হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

কোনো কোনো আলেম এই দলীল দ্বারা এই দাবির পক্ষে দলীল পেশ করেছেন যে, সালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা হবে সালাত পরিত্যাগের কারণে। কারণ, সালাত পরিত্যাগ করাকে এই তিনটি কাজের মধ্যে গণ্য করা যায়। তবে এই মাসআলায় আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন: সালাত পরিত্যাগকারীকে

কাফের বলা যায়। কেউ কেউ বলেছেন: সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা যায় না। তবে কাফের বলার পক্ষে কেউ কেউ অন্য হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আর তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী: "আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়েম না করে এবং যাকাত আদায় না করে"। সহীহ বুখারী হা/২৫।

সুতরাং এই মতের দাবিদার বলেন: দলীলের মূল ভিত্তি হলো এই যে, দুইটি সাক্ষ্য এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের সম্মিলিত বিষয়ের ওপরে তিনি জীবনের নিরাপত্তাকে শর্তযুক্ত করেছেন। আর একাধিক বস্তুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের ফলাফল একমাত্র সকল বিষয়গুলোকে একত্রে বাস্তবায়নের দ্বারাই অর্জিত হয়। আর সেগুলো বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারা উক্ত ফলাফলও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই যুক্তি দ্বারা যদি দলীলে বর্ণিত এই বক্তব্যের মাধ্যমে দলীল পেশ করা উদ্দেশ্য হয়: "আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে"। এই দাবির ভিত্তিতে যে, এই দলীলে বর্ণিত বক্তব্যটি উল্লিখিত শেষ সীমায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ কার্যকর থাকার দাবি রাখে, তাহলে এই যুক্তির দাবিদার অমনোযোগী ও উদাসীনতার শিকার হয়েছেন।

কারণ, কোনো দাবির ভিত্তিতে যুদ্ধ করা আর উক্ত দাবির ভিত্তিতে হত্যা করা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কারণ, مقاتلة – শব্দটি (যুদ্ধ করা বা লড়াই করা) مفاعلة – বাব থেকে এসেছে। যা কোনো কাজে উভয় পক্ষের অংশীদারত্বের দাবিদার। সালাতের জন্য লড়াই করা ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা সালাতের জন্য হত্যা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না যতক্ষণ না সালাত পরিত্যাগকারী আমাদের সাথে লড়াই করে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তাঁর বক্তব্য: "বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তি" এই কথার উদ্দেশ্য হলো: বিবাহিত ব্যক্তি। নারী-পুরুষ সকলেই এর আওতাভুক্ত। আর এই দলীলটি মুসলিমদের ঐকমত্যে সাব্যস্ত মতের পক্ষে দলীল। মতটি হলো: ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি হলো (ফিকহের অধ্যায়সমূহে বর্ণিত) শর্ত সাপেক্ষে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

তাঁর বক্তব্য: "প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ" এটা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾

"আমরা তাদের জন্য তাওরাতে এই বিধান লিপিবদ্ধ (ধার্য) করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (হত্যার শাস্তি স্বরূপ) নেওয়া হবে"। সূরা আল মায়িদা ৫:৪৫।

এখানে প্রাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও স্বাধীনতার দিক সমমানের প্রাণ নেওয়া হবে। যার দলীল হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের ব্যক্তির বিপরীতে হত্যা করা যাবে না"। সহীহ বুখারী হা/৬৯১৫।

একইভাবে ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের নিকট ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা সমমানের বিচারে শর্ত। আর যুক্তিবাদীদের মতে, মুসলিম ব্যক্তিকে যিম্মী ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। আর স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের প্রাণের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। আবার কখনো কখনো তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আর অধিকাংশ আলেম এই মতের বিপক্ষে।

آداب إسلامية

হাদীস – ১৫: ইসলামী শিষ্টাচার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَمُسْلِمٌ.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত হয় উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন অতিথির সম্মান করা।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/৬০১৮, মুসলিম, হা/৪৭।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে” অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তিদানকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত উপনীতকারী পূর্ণাঙ্গ ঈমান রাখে, “সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে”। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান স্থাপন করেছে, সে আল্লাহর ধমকিকে ভয় করে এবং তাঁর প্রদত্ত সওয়াবের আশা রাখে, তাঁর আদেশ পালনে ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর সাধনা করে। আর এমন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো: নিজের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভূতিকে সংরক্ষণ করা, যেগুলো তার অধীন। আর তাকে সেই অঙ্গগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا﴾

"নিশ্চয় শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চেতনাশক্তি এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে"। আল ইসরা ১৭:৩৬। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾

"মানুষ যেকোনো কথাই উচ্চারণ করুক না কেনো, তা সংরক্ষণের জন্য সর্বদা তার নিকট একজন চৌকস পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকে"। কফ ৫০:১৮। আর রসনার আপদ অনেক বেশি।

এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিও আসাল্লাম বলেছেন:

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

"মানুষকে একমাত্র তার রসনা দ্বারা সংঘটিত মন্তব্যের ফলাফল ব্যতীত আর কোনো কারণে জাহান্নামে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে না"। সহীহ: তিরমিযী হা/২৬১৬। তিনি আরো বলেছেন:

«كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تعلى وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ»

"আদম সন্তানের প্রতিটি কথা তার বিপদের কারণ হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকির, সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের প্রতি নিষেধ করা সম্পর্কিত কথা ব্যতীত"। যঈফ: তিরমিযী হা/২৪১২।

সুতরাং যে ব্যক্তি এটা জানে এবং আখিরাতের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আল্লাহর ভয়ে তার রসনাকে সংরক্ষণ করবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন: সকল উত্তম আচরণ চারটি হাদীস থেকে নির্গত হয়েছে: তন্মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীটি অন্তর্ভুক্ত: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে"। অভিধান শাস্ত্রবিদগণের মতে: يصمت – صمت – শব্দটির ميم – অক্ষরে (মুযারে' বহছে) পেশ

হবে। যার মাসদার হলো: صمتا وصموتا وصماتا — অর্থাৎ চুপ থাকা। কেউ কেউ এই হাদীসটির মর্মের ক্ষেত্রে এই মত দিয়েছেন:

যখন মানুষ কথা বলার ইচ্ছা করে, যদি তার কথার শব্দগুলো উত্তম ও বাস্তবিক হয়, তাহলে সে যেনো কথা বলে। অন্যথায় সে যেনো কথা না বলে চুপ থাকে। চাই বাহ্যিকভাবে তার কথাটি হারাম অথবা মাকরূহ, অথবা মুবাহ (বৈধ) যাই হোক না কেনো। এই দৃষ্টিতে মুবাহ কথা পরিত্যাগের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব এই আশঙ্কায় যে, মুবাহ কথা এক পর্যায়ে হারাম অথবা মাকরূহ কথা পর্যন্ত গড়াতে পারে। আর এমনটি অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾

"মানুষ যেকোনো কথাই বলুক না কেনো, তা সংরক্ষণের জন্য সর্বদা তার নিকট একজন চৌকস পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকে"। কফ ৫০:১৮।

আলেমগণ এই বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন যে, মানুষ যত কথা বলে, তার সবই কি তার আমলনামায় লিখা হবে। যদিও তা মুবাহ হয়। নাকি শুধুমাত্র সওয়াব বা শাস্তির উপযুক্ত কথাই লিখা হবে? ইবনু আব্বাস সহ অন্যান্য আলেমগণ দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। এই দৃষ্টিতে উল্লিখিত আয়াতটি নির্দিষ্ট অর্থ বিশিষ্ট হবে অর্থাৎ প্রতিদানযোগ্য যেকোনো কথা সে বলবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "সে যেনো তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে, সে যেনো তার মেহমানকে সম্মান করে"। এখানে প্রতিবেশী ও মেহমানের অধিকার এবং উভয়ের প্রতি স্নেহশীলতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

“জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণের পক্ষে এতবেশী পরিমাণ উপদেশ দিতেন যে, আমি ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ ধার্য করবেন”। সহীহ বুখারী হা/৬০১৪।

আর মেহমানদারি ইসলামের অংশ, সকল নবী ও সালিহীনের চরিত্র। কোনো কোনো আলেম এটাকে ওয়াজিব বলে দাবি করেছেন। অধিকাংশ আলেমের মতে, এটা ইসলামের অন্যতম একটি মহৎ গুণ।

আল ইফসাহ গ্রন্থকার বলেন: এই হাদীস থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষের জন্য মেহমানকে সম্মান করাকে একটি ইবাদত বলে বিশ্বাস করা উচিত। সুতরাং কোনো ধনী ব্যক্তিকে মেহমানদারি করানোর দ্বারা এই ইবাদতের মান ক্ষুন্ন হবে না এবং ধনী মেহমানকে নিজের থেকে কিছু দেওয়ার ফলে ইবাদতের মান নষ্ট হবে না। সুতরাং তাকে সম্মান করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তার চেহারায় দ্রুত হাসি ফুটানো, তার সঙ্গে উত্তম কথা বলা। তবে মেহমানদারির মূল ভিত্তি হলো খাবার খাওয়ানো। সুতরাং অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক দ্বারা মেহমানকে খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা উচিত। তিনি মেহমানদারির ব্যাপারে কিছু কথা বলার পরে বলেছেন: আর তাঁর বক্তব্য: “সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে”। এই কথাটি চুপ থাকার চাইতে উত্তম কথা বলা ভালো সেই বিষয় নির্দেশ করছে। আর খারাপ কথা বলার চাইতে চুপ থাকা ভালো।

কারণ, তিনি উত্তম কথা বলার ক্ষেত্রে আদেশসূচক لام – দ্বারা আদেশ দিয়েছেন। আর উক্ত অক্ষর দ্বারাই প্রথমে চুপ থাকার আদেশ দিয়েছেন। আর উত্তম কথার মধ্যে রয়েছে: আল্লাহর বার্তা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বার্তা মানুষের নিকট প্রচার করা, মুসলিমদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়া, জেনেশুনে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, জেনে বুঝে অসৎ কাজে বাঁধা দেওয়া, মানুষের মাঝে সমঝোতা

করা এবং মানুষকে সর্বদা উত্তম কথা বলা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হলো এমন ব্যক্তির নিকট হক কথা বলা যাকে ভয় করা হয় এবং যার সম্পর্কে সঠিক পথ লাভের ও তাতে অটল থাকার আশা করা যায়।

النهي عن الغضب

হাদীস – ১৬: রাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْصِنِي. قَالَ :لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করো না। লোকটি বার বার রাসূলের নিকট উপেদশ চায় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রাগ করো না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/৬১১৬।]

ব্যাখ্যা: আল ইফসাহ গ্রন্থকার বলেছেন: এমনটিও সম্ভব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তির অত্যধিক রাগ সম্বন্ধে জেনে বিশেষভাবে তাকে এই অসীয়ত করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন যে, রাগ করা অবস্থায় নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়। তিনি বলেছেন:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

“কাউকে বাহু শক্তি দ্বারা ধরাশয়ী করে বাহাদুর হওয়া যায় না। বরং বাহাদুর ঐ ব্যক্তি যে, রাগের সময় নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে”। সহীহ বুখারী হা/৬১১৪।

আর আল্লাহ তা‘আলা রাগ নিয়ন্ত্রণকারী ও মানুষকে ক্ষমাকারীদের প্রশংসা করেছেন।

﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ﴾

যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৪।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ

“যে ব্যক্তি তার রাগকে কার্যকর করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে আহবান করবেন এবং তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী হূর বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে”। হাসান-সহীহ: তিরমিযী হা/২০২১।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “নিশ্চয় রাগ শয়ত্বানের পক্ষ থেকে আসে”। যঈফ: আবূ দাউদ হা/৪৭৮৪।

আর এই জন্যই মানুষ এই অবস্থায় তার স্বাভাবিক আচরণ থেকে বের হয়ে আসে। আর অবান্তর কথা বলতে থাকে, নিন্দিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি জাতীয় নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। এই সবগুলোই রাগ থেকে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এর থেকে মুক্তি দান করুন।

সুলায়মান বিন সুরাদ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “নিশ্চয় বিতাড়িত শয়ত্বান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা রাগকে দূর করে দেয়”। সহীহ বুখারী হা/৬১১৫। অর্থাৎ **أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ’আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম’ **বলা**।

এর কারণ হলো, শয়ত্বানই একমাত্র সত্তা, যে রাগকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। ভবিষ্যত প্রশংসার ব্যাপারে অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শয়ত্বান পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শয়ত্বানের চক্রান্ত প্রতিহত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

الأمر بإحسان الذبح والقتل

হাদীস – ১৭: জবাই ও হত্যার ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আবূ ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু উত্তম পদ্ধতিতে করা আবশ্যক করেছেন। সুতরাং যখন তুমি হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে, আর যখন তুমি জবাই করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারালো করে নেয়া উচিত ও যে জন্তুকে জবাই করা হবে তার কষ্ট লাঘব করা উচিত। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম, হা/ ১৯৫৫।]

ব্যাখ্যা: القتلة – শব্দটির قاف – অক্ষরে যের হবে। যা বস্তুর আকৃতি ও অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে। আর ذبحة – শব্দটির ذال – অক্ষরে যের এবং পেশ হবে। এই হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: “সুতরাং তোমরা উত্তমভাবে জবাই কার্য সম্পন্ন করো” । যদি ذبح – শব্দটির

শেষে ة — অক্ষরটি না থাকে এবং ذال এর ওপরে যবর হয়, তাহলে শব্দটি মাসদার হবে। আর যদি শব্দটির শেষে ة — অক্ষরটি থাকে এবং ذال এর ওপরে যের থাকে, তাহলে শব্দটি বস্তুর গঠন ও অবস্থার অর্থবিশিষ্ট ইসম তথা বিশেষ্য হবে।

তাঁর বক্তব্য: "তোমাদের মধ্যে কেউ (জবাইকারী) যেনো তার ছুরি ধার দিয়ে নেয়"। يُحِدّ — শব্দটির প্রথম অক্ষরে পেশ হবে। যা إفعال — বাব থেকে এসেছে। আরবীতে বলা হয়: أحدالسكين وحدها واستحدها — অর্থ: সে ছুরিতে ধার দিল। তাঁর বক্তব্য: "সুতরাং তোমরা জবেহের প্রাণীকে উত্তমভাবে জবাই করো" এটা সকল প্রকার জবাই যোগ্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আর কিসাস ও হদ্দ হিসেবে হত্যা করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই হাদীসটি অনেকগুলো মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

উত্তমভাবে হত্যা করার অর্থ হলো: সহজে হত্যা করার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়ার নিয়্যাত করবে না। আর চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে সুন্দররূপে জবাই করার অর্থ হলো: চতুষ্পদ জন্তুকে অত্যন্ত নম্রতার সাথে জবাই করবে। আকস্মিকভাবে তাকে আক্রমণ করবে না। তাকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবে না। পশুকে কিবলামুখী করে বিসমিল্লাহ পাঠ করে আল্লাহর নামে প্রশংসার মাধ্যমে জবাই কার্য শুরু করবে। কণ্ঠনালী এবং দুইটি শাহরগ কর্তন করবে। এরপরে তার দেহ স্থির হওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিবে। আল্লাহর নিআমতের স্বীকৃতি ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য এই পশুগুলোকে বশীভূত করে দিয়েছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, আমাদের ওপরে সেগুলোকে কর্তৃত্বায়নের ক্ষমতা প্রদান করতেন। একই সাথে তিনি আমাদের জন্য এমন পশুর গোশতকে হালাল করেছেন। যা তিনি চাইলে আমাদের জন্য হারামও করতে পারতেন।

حسن الخلق

হাদীস – ১৮: উত্তম চরিত্র

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْت، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ." رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ যার জুনদুব ইবনে জুনাদাহ্ এবং আবূ আব্দুর রহমান মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভালো কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোনো কোনো সংকলনে এটাকে হাসান সহীহ বলা হয়েছে। [হাসান: তিরমিযী হা/১৯৮৭।]

ব্যাখ্যা: আবূ যরের কৃতিত্ব অনেক বেশি। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি তাকে নিজ গোত্রের নিকট চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে যখন আল্লাহর রসূল মক্কায় তাঁরই সঙ্গে তার অবস্থানের দৃঢ় সঙ্কল্প দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, তিনি এটা করার মতো সামর্থ রাখেন না। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। যেকোনো গুনাহের পরে নেকীর কাজ করো, তাহলে নেকী পূর্বের গুনাহকে বিলুপ্ত করে দিবে”। এটা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾

"নিশ্চিয় নেকীর কাজসমূহ গুনাহসমূহকে বিলুপ্ত করে দেয়"। সূরা হুদ ১১:১১৪।

আর তাঁর বক্তব্য: "মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো" এর অর্থ হলো: তুমি মানুষের সঙ্গে ঠিক তেমন আচরণ করো, যেমনটি তুমি নিজের ব্যাপারে পছন্দ করো যে, তারা তোমার সাথে করবে। আর জেনে রাখো যে,

أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن

মীযানের পাল্লায় সর্বাধিক ভারী বস্তু হলো উত্তম চরিত্র। সহীহ: তিরমিযী হা/২০০২। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

"নিশ্চয় আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে ওই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী"। সহীহ: তিরমিযী হা/২০১৮।

আর উত্তম চরিত্র নবী, রসূল ও শ্রেষ্ঠ মুমিনগণের অন্যতম গুণ। তারা মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা পরিশোধ করেন না। বরং তারা ক্ষমা করে দেন, চিরতরে অন্যের দোষকে ভুলে যান। তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হলেও তারা উত্তম আচরণ করেন।

احفظ الله يحفظك

হাদীস – ১৯: আল্লাহর দীনের হেফাযত করো, তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَام! إنِّي أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْك، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إذَا سَأَلْت فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوك بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْك؛ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ." رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أمامك، تَعَرَّفْ إلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُك فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك، وَمَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنْ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا."

আবূ আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন- একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহর দীনের হেফাযত করবে, তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায়

তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।" সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। [সহীহঃ তিরমিযী, হা/২৫১৬।]

তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো- যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রাখো- ধৈর্য্য ধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।"

ব্যাখ্যাঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা এর কৃতিত্ব অসংখ্য পরিমাণ। তার জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে দুআ করেছেনঃ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

“হে আল্লাহ, তুমি তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং তাফসীরের জ্ঞান শিক্ষা দাও”। সহীহ বুখারী হা/১৪৩, মুসলিম হা/২৪৭৭, মুসনাদে আহমাদ।

তাকে হিকমার জ্ঞান প্রদান করার জন্য দুইবার তিনি প্রার্থনা করেছেন। সহীহ তিরমিযী হা/৩৮২৩।

তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জিবরীলকে দুইবার দেখেছেন। যঈফঃ তিরমিযী হা/৩৮২২।

তিনি এই উম্মাহর জ্ঞানের সাগর এবং সুমহান পণ্ডিত। তিনি অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অসীয়তের উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। তাই তাকে তিনি বলেছেনঃ

“তুমি আল্লাহর দীনকে হেফাযত করো। আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন”।

এই কথার অর্থ হলো: তুমি তোমার রবের অনুগত, তাঁর আদেশ মান্যকারী, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিহারকারী হয়ে যাও। তাঁর বক্তব্য: “তুমি আল্লাহর দীনকে হেফাযত করো, তাহলে (বিপদে) তাঁকে তোমার নিকটে পাবে”। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের সীমানায় থেকে আমল করো। তিনি যেনো তোমাকে তার বিরোধিতা করতে না দেখেন। তাহলে তাঁকে তুমি সমূহ বিপদের সময় তোমার নিকটে পাবে।

যেমনটি ঘটেছে কঠিন বৃষ্টির কবলে আটকে পড়া তিনজন ব্যক্তির সাথে। যারা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। ঠিক এমন মুহূর্তে একটি পাথর খণ্ড তাদের গহবর মুখে এসে তাদের পথ বন্ধ করে দিল। তখন তারা বলল: তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের মধ্যে কার কী নেক আমল আছে। সংশ্লিষ্ট নেক আমল দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করো। কারণ, তিনিই একমাত্র তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তখন তাদের প্রত্যেকে স্বীয় রবের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অতীতের ঘটনা উল্লেখ করতে শুরু করলো। তখন তাদের সামনে থেকে উক্ত পাথরটি সরে গেল। আর তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসল। তাদের ঘটনা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনা। [সহীহ মুসলিম হা/২৭৪৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “যখন কোনো কিছু প্রার্থনা করবে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আর যখন কোনো বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে”। এখানে মূলত মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা করা, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ না করা। আর তাঁর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে – চাই সেগুলো কম হোক অথবা বেশি – অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট”। সূরা আত তালাক ৬৫:৩।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি) প্রতি ধাবিত হয় তার চাহিদা অথবা অন্তর অথবা তার আশা দ্বারা, সে তার ধাবিত হওয়ার পরিমাণ অনুপাতে ক্ষতি বা উপকারে আসে না এমন ব্যক্তির কারণে তার রবের থেকে বিমুখ হতে থাকে। একইভাবে গায়রুল্লাকে ভয় করা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

“জেনে রাখো, যদি গোটা জাতি তোমার কোনো উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তথাপি তারা তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন”।

একইভাবে ক্ষতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। আর এটাই ঈমান বিল ক্বদর বা তাকদীরের প্রতি ঈমান। আর তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। যখন মুমিন এটা বিশ্বাস করবে, তখন গায়রুল্লাহর নিকট ধর্না দেওয়া এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কী প্রয়োজন আছে? একইভাবে হাওয়ায় ভাসমান অবস্থায় আপনার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে মর্মে জিবরীল আলাইহিস সালাম কর্তৃক সাহায্যের প্রস্তাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উত্তর: আপনার নিকট তো নেই। তাঁর বাণী: ক্বলম লিখা সমাপ্ত হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠাসমূহের অক্ষর শুকিয়ে গেছে”। এটা পূর্ববর্তী বাক্যের একটি তাগিদ মাত্র। অর্থাৎ আমি যা উল্লেখ করলাম বিলুপ্তি বা পরিবর্তনের দ্বারা তার বিপরীতটি ঘটার কোনো সুযোগ নেই।

এরপরে তিনি বলেছেন: “জেনে রাখো, সাহায্য ধৈর্যের সঙ্গে থাকে। আর সমাধান সমস্যার সঙ্গে থাকে। আর দুর্দিনের সঙ্গে স্বচ্ছলতা থাকে”। এখানে তিনি তাকে এই বিষয়ে সাবধান করেছেন যে, মানুষে দুনিয়াতে - বিশেষভাবে সালিহ বা সৎব্যক্তিগণ — দুঃখ ও দুর্দশার মুখোমুখি হন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের ঘাটতি, প্রাণহানি এবং ফল-মূলের পরিমাণ হ্রাস করার দ্বারা পরীক্ষা করবেন। আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। যারা বিপদে আক্রান্ত হলে বলে: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর (ইবাদত) জন্য বেঁচে আছি এবং তাঁর নিকটেই (একদিন) ফিরে যাব। তাদের ওপরে তাদের রবের পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়। আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত”। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾

“নিশ্চয় একমাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান অগণিত পরিমাণে বৃদ্ধি করে পরিশোধ করা হবে”। সূরা আল যুমার ৩৯:১০।

الحياء من الإيمان

হাদীস – ২০: লজ্জা ঈমানের অংশ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আবূ মাসউদ উকবাহ ইবনে আমর আল-আনসারী আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে- যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর।" সহীহ বুখারীতে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/ ৩৪৮৩।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: "প্রাচীনতম ঐশী বাণীর অন্যতম একটি কথা" এর অর্থ হলো: লজ্জা সর্বদা প্রশংসিত, উত্তম ও মানার উপযুক্ত বলে গণ্য হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়াতে এটা কখনো রহিত হয়নি। তাঁর বক্তব্য: "সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা তাই করো" এই বাক্যের দুইটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

এক: শব্দটি আদেশসূচক শব্দে ধমকি ও ভিতি প্রদর্শনের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে এর দ্বারা মূলত আদেশ উদ্দেশ্য নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ﴾ "তোমরা যা চাও, তাই করো"। ফুসিসলাত ৪১:৪০। এটা একটি ধমকি। যেহেতু তিনি তাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করলো, সে যেনো (ভক্ষণের উদ্দেশ্যে) শুকরসমূহ জবাই করে সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে"। যঈফ: আবূ দাউদ হা/৩৪৮৯। এখানে শুকর জবাই করা এবং সেটাকে টুকরা টুকরা করাকে হালাল বলা উদ্দেশ্য নয়।

দুই: কথাটির অর্থ হলো: তুমি এমন যেকোনো কাজ করো, যা প্রকাশিত হলে উক্ত কর্মের কর্তা লজ্জিত হবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

“লজ্জা ঈমানের অংশ”। সহীহ বুখারী হা/২৪, মুসলিম হা/৩৬, ইবনে মাজাহ হা/৪১৮৪, তিরমিযী হা/২০০৯, আবূ দাউদ হা/৪৭৯৫।

এর অর্থ হলো: লজ্জা যেহেতু তার অধিকারীকে অশ্লীলতা থেকে বাঁধা দেয় এবং তাকে কল্যাণ ও নেক কাজে উৎসাহিত করে। ঠিক যেভাবে ঈমান তার অধিকারীকে উক্ত বিষয় থেকে বাঁধা দেয়। আর তাকে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে। ফলে এটা উক্ত ক্ষেত্রে ঈমানের সমমানের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঈমানের স্তরে উপনীত হলো। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

قل آمنت بالله ثم استقم

হাদীস – ২১: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাতে অটল থাকা

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ" :قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاَللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ."

আবূ আমরকে আবূ আমরাহও বলা হয়- সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন- আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন: বল- 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; তারপর এর ওপর দৃঢ় থাকো।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/ ৩৮।]

ব্যাখ্যা: তার (সাহাবী) বক্তব্য: “আমাকে আপনি ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি সামগ্রিক আদর্শিক বাণী বলে দিন, যাতে করে আপনার পরে অন্য কারোর নিকট আমাকে আর এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়”। এর অর্থ হলো: আমাকে ইসলামের যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকারী

সত্তাগতভাবে স্পষ্ট এমন একটি কথা শিক্ষা দিন, যার ব্যাখ্যার জন্য অন্য কারোর নিকট আমাকে দ্বারস্থ না হতে হয়। যার ওপরে ভিত্তি করে আমি আমল করবো এবং তাকওয়া অবলম্বন করবো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির উত্তর দিলেন: তুমি বলো, আমি আল্লাহর ওপরে ঈমান স্থাপন করেছি, এরপরে এই কথার ওপরে অবিচল থাকো"। এটা অন্যতম একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। কারণ, তিনি এই দুইটি বাক্যে প্রশ্নকারীর জন্য ইসলামের ও ঈমানের সামগ্রিক বিষয় একত্রিত করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি তাকে তার অন্তর দ্বারা স্মরণ করা অবস্থায় রসনা দ্বারা নিজ ঈমানকে নবায়নের আদেশ দিয়েছেন। আর তাকে যাবতীয় আনুগত্যমূলক আমলগুলোর ওপরে সরলভাবে অবিচল থাকা এবং সকল বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু সামান্য পরিমাণ বক্রতার সঙ্গেও অবিচলতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, অবিচলতা বক্রতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর ন্যায়:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ﴾

"নিশ্চয় যারা বলে: আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এরপরে তারা সরলভাবে এর ওপরে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়"। ফুসিসলাত ৪১:৩০।

আয়াতটির অর্থ হলো: যারা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এরপরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দেওয়া পর্যন্ত উক্ত ঈমানের প্রতি এবং আনুগত্যের প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে তারা অবিচল থাকে। উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

"আল্লাহর শপথ! তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা কখনো শেয়ালের ন্যায় চাতুরতার আশ্রয় নেননি"। এর অর্থ হলো: তারা কর্মে, কথায় ও বিশ্বাসে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অবিচল ছিলেন। এর ওপরে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করেছেন। এটাই

অধিকাংশ মুফাসসিরের মত। ইনশা আল্লাহ এটাই এই হাদীসের অর্থ হবে। একইভাবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾

“ঠিক যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, সেভাবেই (দীনের ওপরে) প্রতিষ্ঠিত থাকুন”। হুদ **১১:১১২**।

ইবনু আব্বাস বলেছেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপরে সমগ্র কুরআন নাযিল হওয়ার মধ্যে সর্বাধিক কঠিন আয়াত ছিল এটি। এই জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাকে সূরা হূদ ও এর সহযোগী সূরাগুলো বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে”। সহীহ: তিরমিযী হা/৩২৯৭।

উসতাদ আবুল কাশেম আল কুশাইরী রহিমাহুল্লাহু তা‘আলা বলেছেন: অবিচলতা এমন একটি স্তর, যার দ্বারা সকল বস্তু পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতায় উন্নীত হয়। এটা অস্তিত্বশীল হওয়ার দ্বারা প্রচুর কল্যাণ অর্জিত হয় এবং কল্যাণ (যথাযথভাবে) বিধান করা যায়। আর যে ব্যক্তি সাধনা করা অবস্থায় অবিচল থাকতে পারে না, তার সাধনা বিফলে যায়। তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি বলেন: কেউ কেউ বলেছেন: অবিচল থাকা একমাত্র মহান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ বাস্তবায়ন করতে পারে না। যেহেতু এটা বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রচলিত স্বাভাবিক রীতি থেকে বের হয়ে আসতে হয়। প্রচলিত কালচার ও স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। মহান আল্লাহ তা‘আলার সামনে প্রকৃত সত্য নিয়ে দণ্ডায়মান হতে হয়। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا

“তোমরা সরল পথে অবিচল থাকো। কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত আমল করতে যেয়ো না”। সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২৭৭।

ওয়াসিত্বী বলেছেন: ইসতিক্বামাহ তথা নেক কাজের প্রতি অবিচলতা এমন স্বভাব যার মাধ্যমে উত্তম গুণাবলি পূর্ণতা লাভ করে এবং যার অভাবে উত্তম গুণাবলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة

হাদীস – ২২: ফরয বিধান পালনেই জান্নাত

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا" :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: أَرَأَيْت إذَا صَلَّيْت الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْت رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْت الْحَلَالَ، وَحَرَّمْت الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ."

আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয সালাত আদায় করি, রমযানে সিয়াম রাখি, হালালকে হালাল বলে ও হারামকে হারাম বলে ঘোষণা করি, আর এর বেশি কিছু না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/১৫।]

ব্যাখ্যা: এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি হলেন নুমান বিন ক্বাওক্বাল। শায়েখ আবূ আমর ইবনুস সালাহ বলেছেন: বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তিনি “আমি হারামকে হারাম সাব্যস্ত করেছি” এই কথা দ্বারা দুইটি বিষয় তিনি উদ্দেশ্য করেছেন: এক: এটাকে হারাম বিশ্বাস করা। দুই: এটা পালন না করা। পক্ষান্তরে হালালকে হালাল সাব্যস্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উক্ত বিষয়টিকে হালাল বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। আল

মুফহিম গ্রন্থের লেখক বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর জন্য এই হাদীসে সামগ্রিকভাবে কোনো নফল ইবাদতের কথা উল্লেখ করেননি। আর এই বিষয়টি এই দাবির প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, সামগ্রিকভাবে নফল ইবাদত পরিত্যাগ করা জায়েয। কিন্তু যে এটা পরিত্যাগ করে এবং পালন না করে, সে নিজেকে অনেক বড় লভ্যাংশ এবং বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত করলো। আর যে ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে কোনো সুন্নাহ পরিত্যাগ করে, তার এই কর্ম তার দীনের মাঝে ত্রুটি সৃষ্টি করবে। তার ন্যায়পরায়ণতার ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে। যদি সে সুন্নাহ এর প্রতি শিথিলতা এবং অবজ্ঞা স্বরূপ সেটা পরিত্যাগ করে, তবে তার এমন কাজ সমালোচনাযোগ্য অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

আমাদের আলেমগণ বলেছেন: যদি কোনো শহরের অধিবাসীগণ কোনো সুন্নাহ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একমত হয়, তবে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই মত থেকে ফিরে না আসবে। সাহাবা রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম এর প্রথম যুগ এবং তাদের পররবর্তী যুগের ব্যক্তিগণ সুন্নাহর ওপরে ততটাই সচেতন ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, যতটা ফরযের ওপরে ছিলেন। তারা সওয়াব অর্জন বিবেচনায় উভয়টির মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না। বরং ফকীহ ইমামগণ এগুলোর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এগুলো পরিত্যাগের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রেক্ষিতে। যেমন: পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হওয়া, পুনরায় আদায় না করা, এগুলো পরিত্যাগের ক্ষেত্রে শাস্তির ভয়। আর যদি কোনো বিশেষ কারণে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে শাস্তির বিষয়টি নাকচ করে দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজীকরণ ও সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে সুন্নাহ ও ফরযের ব্যাপারে সতর্কীকরণকে পরিত্যাগ করেছেন তাঁর যুগ ইসলাম প্রতিষ্ঠার খুবই নিকটতম ছিল এই জন্য। যাতে করে অতিরিক্ত চাপ মানুষের মাঝে বিরক্তিকর মনোভাব সৃষ্টি না করে। আর তিনি জানতেন যে, যদি ইসলামের ব্যাপারে তাদের হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্ষকে আরো প্রসারিত করে দেন, তাহলে অন্যদের হৃদয়কে তিনি যেভাবে ইসলামের ব্যাপারে

আগ্রহী করে দিয়েছেন, তাদের হৃদয়কেও অনুরূপ আগ্রহী করে দিবেন। অথবা এটা এই জন্য পরিহার করেছেন, যাতে করে এই বিশ্বাস সৃষ্টি না হয় যে, সুন্নাহ ও নফল ইবাদতসমূহ ওয়াজিব। একইভাবে শেষ হাদীসটিতে বলা হয়েছেঃ জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলো সালাত সম্পর্কে। তখন তিনি উত্তর দিলেন: সালাত পাঁচ বার আদায় করতে হয়। তখন তিনি বললেন: আমার ওপরে কি আর কোনো সালাত আছে? তিনি বললেন: “না, তবে স্বেচ্ছায় নফল আদায় করতে পারো”। এরপরে তিনি তাঁকে সিয়াম, হজ্জ ও অন্যান্য শারঈ বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন। শেষে তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি এর ওপরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বৃদ্ধিও করবো না এবং হ্রাসও করবো না। তখন তিনি বললেন: “যদি সে সত্য বলে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সফল”। সহীহ বুখারী হা/৪৬, সহীহ মুসলিম হা/১১।

অপর বর্ণনায়: “যদি সে আদিষ্ট বিষয় শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। সহীহ মুসলিম হা/১৩।

এই প্রশ্নকারী পূর্বোক্ত হাদীসের প্রশ্নকারীর ক্ষেত্রে (দীনকে) সহজীকরণের স্বার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন, যতদিন পর্যন্ত তাদের মানসিকতা মুসতাহাব আমলসমূহ পালন করা এবং দীন বুঝার ক্ষেত্রে প্রশস্ত না হয়। যখন তাদের হৃদয় প্রশস্ত হবে, তখন তাদের নিকটেও এটা পালন করা সহজ হয়ে যাবে। আর এটাকেই – অর্থাৎ ফরয আমলসমূহ সংরক্ষণ করা, সেগুলো প্রতিষ্ঠা করা এবং যাবতীয় ত্রুটিমুক্তভাবে যথাসময়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করাকে – বহুমূখী সাফল্য ও উন্নতি বলা হয়। হায়, যদি আমরা এভাবে অবিচল হতে পারতাম। আর যে ব্যক্তি ফরয আমল পালনের পরে নফলও পূর্ণ করে, সে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করবে। আর এগুলোকে শারঈ আমলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একমাত্র ফরযসমূহ পূর্ণ করার জন্য।

الإسراع في الخير

হাদীস – ২৩: কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়া

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" :الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ –أَوْ: تَمْلَأُ– مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا." رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আবূ মালেক আল-হারেস ইবনে আসেম আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তাহারাত বা পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক; আল-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) [বললে] পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ্ (আল্লাহ কতই না পবিত্র! এবং সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) উভয়ে অথবা এর একটি আসমান ও যমীনের মাঝখান পূর্ণ করে দেয়। সালাত হচ্ছে আলো, সাদকা হচ্ছে প্রমাণ, সবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে- আর তা হয় তাকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম, হা/২২৩।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি ইসলামের একটি মহৎ মূলনীতি। যা ইসলাম এবং দীনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্বলিত। এখানে طهور – শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রিয়া। অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। অগ্রগণ্য মতে শব্দটির প্রথম অক্ষরে পেশ হবে।

শব্দটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে: কেউ বলেছেন: এই কর্মটির সওয়াব (সর্বোচ্চ) ঈমানের অর্ধেক সওয়াব পর্যন্ত উপনীত হতে পারে। কেউ

কেউ বলেছেন: এখানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সালাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমানের (সালাত) প্রতিদান নষ্ট করবেন না"। আর পবিত্রতা হলো সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত। ফলে এটা সালাতের একাংশে পরিণত হয়েছে। আর বস্তুর একাংশভুক্ত হওয়ার জন্য যথাযথ অর্ধাংশ হওয়া জরুরী নয়। কেউ কেউ ভিন্ন মতও দিয়েছেন।

আর তাঁর বাণী: "আলহামদু লিল্লাহ এর নেকী দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়"। এর অর্থ হলো: এই বাক্যটির সওয়াব অনেক বড় হওয়ার কারণে সেটা প্রশংসাকারীর দাঁড়ি পাল্লা পূর্ণ করে দেয়। আমলসমূহ পরিমাপ করা, দাঁড়ি পাল্লা ভারী হওয়া এবং হালকা হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতের বহু দলীল বিদ্যমান রয়েছে। একইভাবে আল্লাহ তাঁর বাণী: "সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ উভয়টি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়"।

আর এগুলোর এত বেশি মহত্ত্বের মূল কারণ হলো, যেহেতু এই যিকিরগুলো মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার মর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর تملأ أوتملآن – এই শব্দ দুইটিকে অক্ষরের ওপরে দুই নুক্তা বিশিষ্ট تاء – সহকারে আমরা আত্মস্থ করেছি। আর এটাই সহীহ। সুতরাং প্রথমটি দ্বিবচন বিশিষ্ট যমীর (সর্বনাম)। আর দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ বাক্যের সর্বনাম।

কেউ কেউ বলেছেন: يملآن – তথা শব্দটিতে ياء – সহকারেও পড়া যাবে। অর্থাৎ মুযাক্কার (পুংলিঙ্গ) ও মুয়ান্নাস (স্ত্রী লিঙ্গ) উভয়রূপেই শব্দটি পড়া যায়। মুয়ান্নাসের কারণটি আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। আর মুযাক্কারের ভিত্তি হলো, উভয় প্রকার বাক্যকে উদ্দেশ্য করে সেটাকে মুযাক্কার দ্বারা ব্যক্ত করা। আর تملأ – শব্দটিকে মুযাক্কার পড়া যাবে যখন উক্ত ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট বাক্যকে মুযাক্কার বিবেচনা করা হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "সালাত হলো নূর"। এর

উদ্দেশ্য হলো: এটি অপরাধ থেকে বিরত রাখে এবং অশ্লীলতা ও ঘৃণ্য কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সঠিক পথের দিশা দেয়। ঠিক যেভাবে নূর থেকে আলো আহরণ করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো: সালাত তার পালনকারীর জন্য কিয়ামতের দিবসে নূরে পরিণত হবে। কেউ কেউ বলেছেন: এটা কিয়ামতের দিবসে তার পালনকারীর চেহারায় উজ্জ্বল আলো হয়ে ফুটে উঠবে এবং দুনিয়াতেও তার চেহারায় উজ্জ্বলতার ছাপ থাকবে। পক্ষান্তরে যে সালাত আদায় করেনি, তার চেহারার অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "সাদাকা একটি স্পষ্ট প্রমাণ"। এই বিষয়ে তাজরীদ গ্রন্থকার বলেছেন: এর অর্থ হলো: সাদাকাকারী ব্যক্তি সাদকার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে। ঠিক যেভাবে সে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে। যেনো বান্দাকে যখন কিয়ামতের দিবসে তার সম্পদের ব্যয়ের খাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তার সাদাকা এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে তার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে সে বলতে পারবে: আমি এটা সাদাকা করেছি। অন্যরা বলেছেন: এর অর্থ হলো: সাদাকা তার কর্তার ঈমানের পক্ষে স্পষ্ট দলীল বলে বিবেচিত হবে। কারণ, মুনাফিক্ব সাদাকা থেকে বিরত থাকে এর প্রতি তার বিশ্বাস না থাকার কারণে। সুতরাং যে ব্যক্তি সাদাকা আদায় করে, সে তার সাদাকা দ্বারা তার ঈমানী শক্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "ধৈর্য হলো উজ্জ্বল আলো"। এর অর্থ হলো: শরীআতে পছন্দনীয় ধৈর্য হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি অটল থাকা। তাঁর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকা। একইভাবে পার্থিব বিপদ আপদ, দুনিয়ার বৈচিত্রময় সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করাও সবর।

মোটকথা ধৈর্য একটি প্রশংসনীয় বিষয়, যার ধারক চিরকাল এর দ্বারা আলোকিত, হেদায়েত প্রাপ্ত ও সঠিক পথের ওপরে অবিচল থাকে।

ইবরাহীম খাওয়াস বলেছেন: সবর হলো উত্তম শিষ্টাচারের সাথে বিপদ আপদে কুরআন ও সুন্নাতের ওপরে অটল থাকা। আবূ আলী আদ দাক্বক্বাক্ব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সবর হলো: ভাগ্যে নির্ধারিত বিষয়ের ওপরে কোনো আপত্তি উত্থাপন না করা। তবে অভিযোগের উদ্দেশ্যে বিপদের কথা প্রকাশ করাটা ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আল্লাহ তা'আলা আইয়ূব আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে বলেছেন: "নিশ্চয় আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি"। যদিও তিনি অভিযোগের সূরে বলেছিলেন: "হে আমার রব, আমাকে অনিষ্টতা গ্রাস করেছে। আর আপনি নিঃসন্দেহে সর্বাধিক দয়ালু"। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "কুরআন হয়তো তোমার পক্ষে প্রমাণ হবে অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ হবে"। এই কথার অর্থ হলো: অর্থটি খুবই স্পষ্ট অর্থাৎ তুমি এর দ্বারা উপকৃত হবে যদি তা তেলাওয়াত কর এবং সেই অনুযায়ী আমল কর। অন্যথায় সেটা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ হবে। আর তাঁর বাণী: প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যুষে ঘর থেকে বের হয়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। এরপরে হয়তো সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করতে পারে। অথবা নিজেকে সেই আগুনের দিকে ঠেলে দেয়"। এই কথার অর্থ হলো: প্রত্যেকটি মানুষই নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাদের মাঝে অনেক ব্যক্তি এমন আছে, যারা নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দেয়। এরপরে হয়তো সে নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জীবন এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন"। সূরা আত তাওবা **৯:১১১**।

অপর দিকে অনেক ব্যক্তি এমনও আছে, যারা নিজেকে শয়ত্বান ও প্রবৃত্তির নিকট বিক্রি করে দেয় তাদের অনুকরণের মাধ্যমে। ফলে সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার আনুগত্য অনুসারে আমলের তাওফীক দিন। আর নিজেদের সত্তাকে আপনার বিরোধিতার পথে পরিচালিত করে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

تحريم الظلم

হাদীস – ২৪: জুলুম করা হারাম

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ" :يَا عِبَادِي: إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَّا مَنْ هَدَيْته، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلَّا مَنْ أَطْعَمْته، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إلَّا مَنْ كَسَوْته، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আবূ যর আল-গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গোনাহ করছ, আর আমি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে

দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/২৫৭৭।]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য: "নিশ্চয় আমি জুলুমকে নিজের ওপরে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও সেটাকে হারাম করেছি"। কিছু কিছু আলেম বলেছেন: এর অর্থ হলো: আমার জন্য সমীচীনও নয় এবং জায়েযও নয়। ঠিক যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "মহান দয়ালু রহমানের জন্য সন্তান গ্রহণ করাটা সমীচীন নয়"। সূরা মারইয়াম ১৯:৯২

সুতরাং জুলুম আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেউ কেউ এই হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছেন: কারোর জন্য তার প্রতিপক্ষের বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র ন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা বৈধ হবে না। যা মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে: "নিশ্চয় আমি জুলুমকে নিজের ওপরে নিষিদ্ধ করেছি"।

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে পারেন না। তাহলে একজন ধারণাকারী কীভাবে এই ধারণা করতে পারে যে, তিনি অন্য কারোর জন্য নিজের বান্দাদের প্রতি জুলুম করবেন? একইভাবে তিনি বলেছেন: "সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি জুলুম করবে না"। অর্থাৎ নিপীড়িত ব্যক্তি নিপীড়ক থেকে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এই শব্দে দুইটি تاء — একটিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে উচ্চারণ সহজীকরণের জন্য। মূলত শব্দটি এমন ছিল: فلا تتظالموا। তাঁর বাণী: "তোমাদের প্রত্যেকেই দিশেহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি দিশা দিয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে আমি পোশাক পরিয়েছি। তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে

আমি খাবার দিয়েছি"। এই বাণিটি আমাদের দারিদ্রতা, কল্যাণ হাসিলে আমাদের অক্ষমতা, ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থহীনতার প্রতি একটি সতর্কবাণী। তবে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য করলে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব। এই বাক্যটি মূলত এই অর্থের প্রতি নির্দেশ করছে: "কোনো বিষয় পরিবর্তন করার সক্ষমতা এবং কোনো কাজ সম্পন্ন করার শক্তি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নেই"। যখন বান্দা এই নিআমতের ফলাফল নিজের ওপরে দেখবে, তখন সে যেনো এটা অনুধাবন করতে পারে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। এর ফলে তার ওপরে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করা নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যতবারই সে এই কথাটি বলবে, ততবারই সে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরীয়ার পথে একধাপ অগ্রসর হবে। তাঁর বাণী: "তোমরা আমার নিকট হেদায়েত কামনা করো, আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো"। অর্থাৎ আমার নিকট তোমরা হেদায়েত প্রার্থনা করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো।

এই বিষয়ে মোটকথা হলো: বান্দার এই কথা অনুধাবন করা যে, সে তার মালিকের নিকট হেদায়েত প্রার্থনা করার ফলেই তিনি তাকে হেদায়েত দিয়েছেন। আর যদি তিনি বান্দার প্রার্থনার পূর্বেই তাকে হেদায়েত দান করেন, তাহলে বান্দার পক্ষে এমন কথা বলা অসম্ভব নয়: আমি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছি আমার নিজের জ্ঞানের কল্যাণে।

একইভাবে "তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত" শেষ পর্যন্ত। এই কথার অর্থ হলো: তিনি সকল সৃষ্টিকেই সৃষ্টি করেছেন খাবারের প্রতি মুখাপেক্ষী করে। ফলে প্রত্যেক খাদক ব্যক্তি মাত্রই সে ক্ষুধার্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রিযিক তার নিকটে পৌঁছে দেওয়া এবং খাবার প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংস্কারের মাধ্যমে তার খাবারের ব্যবস্থা না করেন। ফলে কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি যেনো এটা কল্পনা না করে যে, তার হাতে থাকা রিযিক, যা সে নিজের মুখে তুলেছে, সেটা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ তাকে আহার করিয়েছে। এখানে

ফকীরদের আদব সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেনো তিনি বলেছেন: তোমরা আমি ব্যতীত অন্য কারোর নিকট খাদ্য প্রার্থনা করো না। কারণ, যাদের নিকট তোমরা খাদ্য প্রার্থনা করছ, তাদেরকেও আমিই খাদ্য দিয়েছি। "সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাবার প্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে আহার করাবো"।

একইভাবে পরবর্তী বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্যও একই। তাঁর বাণী: "তোমরা রাতে ও দিবসে পাপ কাজ করছ"। এই বাক্যে এমন এমন ভঙ্গিতে তিরস্কার করা হয়েছে, যা অনুধাবন করা মাত্রই প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি লজ্জিত হবে। একইভাবে রাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করার জন্য। যেই সময়ে সাধারণত আমলসমূহ লৌকিকতা ও কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। তাহলে মুমিন কি রাত্রে আল্লাহর পথে দান না করার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করবে না, যখন আমলসমূহ সাধারণত লৌকিকতা ও কপটতা থেকে মুক্ত থাকে। মুমিন কি এই কারণে রাত্রে দান না করার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করবে না যে, তাকে অন্যান্য মানুষদের উপস্থিতিতে সাক্ষ্যযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য উচিত এই সময়েও (দিনে) আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। প্রকাশ্যে দিবালোকে মানুষের সামনে আল্লাহর নাফরমানী না করা। মুমিনের জন্য এটা কীভাবে উত্তম হয় যে, সে গোপনে ও প্রকাশ্যে গুনাহ করবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরে এই কথা বলেছেন: "আর আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেই"। তিনি ذنوب – শব্দটিকে তারীফ তথা নির্দিষ্টবাচক আলিফ ও লাম সহ উল্লেখ করেছেন। আর সেটাকে جميعا – শব্দটি দ্বারা আরো গুরুত্ববহ করে তুলেছেন। আর এই কথাটি তিনি আমাদেরকে ইসতিগফার করার আদেশ দেওয়ার পূর্বেই বলেছেন, যাতে করে কোনো বান্দা গুনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ না হয়।

তাঁর বাণী: “হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, তোমাদের সকল মানব ও দানব” শেষ পর্যন্ত। এই বাক্যে বলা হয়েছে: মুত্তাক্বীদের তাকওয়া তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। তবে এই তাকওয়া তার রাজত্ব ও ক্ষমতার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না। আর তাঁর বাণী: “যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং মানব ও দানব সকলে একটি ভূমির চূড়ায় আরোহণ করে” শেষ পর্যন্ত। এই বাণীতে সৃষ্টিজীবকে প্রার্থনার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা ও স্রষ্টার নিকট চাওয়ার বিষয়টিকে আরো ব্যাপক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো প্রার্থী যেনো প্রার্থনার ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা না করে। কোনো দাবিদার যেনো তার দাবি সংক্ষিপ্ত না করে। যেহেতু আল্লাহর নিকটে থাকা সম্পদ কখনো হ্রাস হয় না। তাঁর ভাণ্ডারসমূহ কখনো নিঃশেষ হয় না। সুতরাং কোনো ধারণাকারী এই ধারণা পোষণ না করে যে, দান করার দ্বারা আল্লাহর নিকটে থাকা ধন ভাণ্ডার কমে যাবে। যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর একটি হাদীসে বলেছেন: “আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। রাত-দিন জুড়ে দান করলেও এই হাত কখনো নিঃশেষ হবে না। তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির শুরু থেকে তিনি কী পরিমাণ দান করেছেন। তথাপি তাঁর ডান হাতের সম্পদ এতটুকুও হ্রাস পায়নি”। সহীহ বুখারী হা/৪৬৮৪, সহীহ মুসলিম হা/৯৯৩।

এর মূল রহস্য হলো, তাঁর ক্ষমতা সর্বদা নতুন সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে। এই সক্ষমতার মাঝে কখনো অক্ষমতা ও স্বল্পতার উদ্ভব হতে পারে না। আর তাঁর সক্ষমতার সম্ভাব্য সৃষ্টির সংখ্যা অগণিত ও অসীম। তাঁর বাণী: “তবে সুঁই সাগরে প্রবেশ করালে সাগর থেকে যতটুকু পানি হ্রাস হয়, ঠিক ততটুকু হ্রাস হয়”। এটা মূলত একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যা দ্বারা তিনি আমাদের স্বচক্ষে দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা আমাদের বিবেককে সহজে বুঝাতে চেয়েছেন।

বাক্যটির মূল অর্থ হলো: এই দান তাঁর ভাণ্ডারে থাকা বস্তুকে সামান্য পরিমাণে হ্রাস করতে পারবে না। مِخيط – শব্দের ميم অক্ষরে যের হবে।

خاء – অক্ষরে সুকূন হবে। আর ياء – অক্ষরে যবর হবে। শব্দটির অর্থ হলো সুই। তাঁর বক্তব্য: "এগুলো তোমাদের কর্মসমূহ মাত্র। যা আমি গণনা করে সংরক্ষণ করছি তোমাদেরই জন্য। এরপরে তোমাদেরকেই সেগুলো পূর্ণরূপে আদায় করে দিব। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ (পরকালীন সাফল্য) লাভ করবে, সে যেনো আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে"। অর্থাৎ সে যেনো তার আনুগত্যকে এবং তার ইবাদতকে নিজের আমল হিসেবে গণ্য না করে। বরং সেই আমলকে আল্লাহর তাওফীক এর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে। তাঁর বক্তব্য: "আর যে অন্য কিছু লাভ করবে"। তিনি এই কথা বলেননি যে, "যে ব্যক্তি অকল্যাণ লাভ করবে"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বোত্তম প্রতিদান পেল না, সে যেনো একমাত্র নিজেকেই তিরস্কার করে। শব্দটিকে তাগীদের نون – দ্বারা তিনি ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয় থেকে সাবধান করার জন্য যে, আমলকারীর অন্তরে যেনো এই চিন্তার উদয় না হয় যে, সে তিরস্কারের উপযুক্ত হয়েছে নিজের কারণে নয়। অন্য কোনো কারণে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ذهب أهل الدثور بالأجور

হাদীস – ২৫: (দানের মাধ্যমে) সম্পদশালীদের নেকী অর্জন করা

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا، " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ

وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর কিছু সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা সালাত পড়ি তারাও সেরকম সালাত পড়ে, আমরা সিয়াম রাখি তারাও সেরকম সিয়াম রাখে, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দান করে।

তিনি বলেন: আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে তোমরা দান করতে পার। প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহান আল্লাহ) হচ্ছে দান, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে দান, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) হচ্ছে দান, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে দান, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে দান এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে দান। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে দান।

তারা জিজ্ঞাসা করেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্খা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে? তিনি বলেন: তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গোনাহগার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/ ১০০৬।]

ব্যাখ্যা: دثور – শব্দের دال – অক্ষরে পেশ হবে। যা دثر – শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো: অঢেল সম্পদ। তাঁর বক্তব্য: "তোমরা দান করতে সক্ষম হও এমন বস্তু কি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তৈরী করেননি"। এখানে تصدقون – শব্দটির صاد – ও دال – অক্ষর তাশদীদ

যুক্ত হবে। অভিধান অনুসারে صاد — অক্ষর তাশদীদ বিহীন পড়াও জায়েয আছে। এই হাদীসটিতে তাসবীহ ও সকল যিকির এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং মুবাহ (বৈধ) কর্মসমূহে ইবাদতের নিয়্যাত মস্তিষ্কে উপস্থিত রাখার মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর বৈধ কর্মসমূহ একমাত্র সত্য নিয়্যাতের দ্বারাই কেবল ইবাদতে পরিণত হয়। এই হাদীসে প্রশ্নকারীর জন্য তার অজানা দলীল সম্পর্কে প্রশ্ন করা জায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল বিদ্যমান। যদি সে এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, উত্তরদাতা তার প্রশ্নের কারণে কষ্ট পাবে না এবং এটা আদবের খেলাফ হবে না এবং প্রশ্নকারীর নিকট অজানা কিছু বিষয়ের দলীল একজন আলেম বর্ণনা করতে পারেন এই বিষয়টিও বুঝা যায়।

তাঁর বক্তব্য: "সৎ কাজের নির্দেশ একটি দান। অসৎ কাজের নিষেধ একটি দান"। এই বক্তব্যে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দান-সাদাকার প্রতিদান সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি উক্ত প্রতিদান তাসবীহ ও এর পরবর্তী যিকিরসমূহের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হওয়ার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি ফরযে কিফায়া বিধান। যা ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্টভাবে ধার্য হয়। পক্ষান্তরে নফল যিকিরসমূহ এর বিপরীত। আর ফরযে কিফায়ার প্রতিদান নফলের চাইতে অধিক। যেই বিষয়টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে নির্দেশ করা হয়েছে: "আমার পক্ষ থেকে ফরযকৃত কোনো কর্ম দ্বারা যদি আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়, তাহলে সেটা আমার নিকট অধিক প্রিয়"। হাদীসটি বুখারী (হা/৬৫০২) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: ফরয আমলের সওয়াব নফল আমলের চাইতে সত্তর গুণ অধিক হয়ে থাকে। এ বিষয়টি তারা একটি হাদীস দ্বারা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু হাদীসটি যঈফ (সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৮৭১)।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "তোমাদের সহবাস কর্মও একটি দান"। এখানে بضع – শব্দটির باء – অক্ষরে পেশ হবে। যা সহবাস ও লজ্জাস্থান উভয়টির ওপরেই প্রয়োগ হয়। আর এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ হবে। আর এই বিষয়টি পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে যে, মুবাহ কর্মসমূহ নিয়্যাতের দ্বারা ইবাদতে পরিণত হয়। সুতরাং সহবাসও ইবাদত হবে। যদি মানুষ উক্ত কর্ম তার স্ত্রীর হক পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পালন করে। এবং তার সঙ্গে সদাচরণের উদ্দেশ্যে, অথবা একজন নেককার সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে, অথবা নিজেকে বা স্ত্রীকে (গুনাহ থেকে) পূত-পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো নেক উদ্দেশ্যে সহবাস করে।

আর তাদের (সাহাবা) প্রশ্ন: "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের কারোর যদি প্রবৃত্তির চাহিদা উদ্দীপ্ত হয়, তাহলে সে কি এমন চাহিদার ক্ষেত্রেও সওয়াব পাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর উত্তর: "তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, প্রবৃত্তির চাহিদায় উজ্জীবিত ব্যক্তি যদি তার চাহিদা হারাম স্থানে পূরণ করে, তাহলে কি তাকে এই অপকর্মের বোঝা বহন করতে হবে না"? শেষ পর্যন্ত।

এই বক্তব্যে কিয়াস করার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা সর্ব মতের আলেমদের মাযহাব। এই বিষয়ে একমাত্র যাহেরী সম্প্রদায় দ্বিমত পোষণ করেছে। আর তাবেঈ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত কিয়াস সম্পর্কিত নিন্দামূলক বক্তব্যের উদ্দেশ্য মুজতাহিদ ও ফকীহগণের নিকট প্রচলিত কিয়াস নয়। এই কিয়াসটি হলো কিয়াস আল 'আকস। তথা দলীলে বর্ণিত একটি কর্মের বিধান দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত কর্মের বিধানকে সাব্যস্ত করা। উসূলবিদগণ এই কিয়াস অনুসারে আমল করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে এই ক্বীয়াসের ওপরে আমল করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এই হাদীসটিই স্পষ্ট দলীল।

فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم

হাদীস – ২৬: মানুষদের মাঝে সংশোধন, ন্যায়বিচার ও সহযোগিতা করার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" :كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ .

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেহ যখন সূর্য উঠে মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক গ্রন্থির সাদাকা দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দু’জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সাদাকা, কোনো আরোহীকে তার বাহনের ওপর আরোহন করতে বা তার ওপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সাদাকা, ভালো কথা হচ্ছে সাদাকা, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সাদাকা এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সাদাকা।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী হা/২৯৮৯, সহীহ মুসলিম হা/১০০৯।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: **“গ্রন্থিজোড়া”** । শব্দটির سين – অক্ষরে পেশ হবে। আর لام – অক্ষর তাশদীদ বিহীন হবে। শব্দটির অর্থ হলো: গ্রন্থিজোড়ার কেন্দ্রে অবস্থিত অস্থিসমূহ এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এমন অঙ্গগুলোর সংখ্যা তিনশ ষাটটি। ক্বাযী আয়ায বলেছেন: শব্দটি মূলত তালু, আঙ্গুল ও চরণের অস্থিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। পরবর্তীতে শরীরের প্রতিটি অস্থি ও গ্রন্থিজোড়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে থাকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: এই কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ভয় ও আশাব্যঞ্জক দান, বাধ্যতামূলক ও জরূরী দান নয়। তাঁর বক্তব্য: “দুইজনের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করা একটি দান-সাদাকা”। অর্থাৎ দুইজনের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করবে।

সহীহ মুসলিমের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “তোমাদের প্রতিটি গ্রন্থিজোড়ার ওপরেই তোমাদের পক্ষ থেকে দান-সাদাকা করতে হবে। প্রতিটি তাসবীহ একটি দান। প্রতিটি প্রশংসা একটি দান। প্রতিটি তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা) একটি দান। প্রতিটি তাকবীর একটি দান। সৎ কাজের আদেশ একটি দান। অসৎ কাজের নিষেধ একটি দান। আর এই সকল দান সাদাকার প্রয়োজনমুক্ত করে দিবে মাত্র দুই রাকআত সালাত, যা পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে আদায় করা হয়”। সহীহ মুসলিম হা/২৫৫৩। অর্থাৎ এই অঙ্গগুলোর সকল সাদাকাগুলোর বিপরীতে মাত্র দুই রাকআত সালাতই দান হিসেবে যথেষ্ট। যেহেতু সালাত শরীরের সকল অঙ্গগুলোকে কর্ম প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। সুতরাং যখন কেউ সালাত আদায় করে, তখন তার প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

البر حسن الخلق

হাদীস – ২৭: পূণ্য হলো উত্তম চরিত্র

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِك، وَكَرِهْت أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ؟ قُلْت: نَعَمْ. فقَالَ: استفت قلبك، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ

إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. "حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالدَّارِمِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

আন-নওয়াস ইবনে সাম'আন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "উত্তম চরিত্র হচ্ছে নেকী, আর গোনাহ্ হচ্ছে যা তোমার মনকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে এবং লোকে জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/২৫৫৩।]

ওয়াবেসা ইবনে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন: "তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বলি: জী হাঁ। তিনি বললেন: "নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর; যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকী, আর গোনাহ্ হচ্ছে তা যা যদিও লোক (তার স্বপক্ষে) ফাতাওয়া দিয়ে দেয় তবুও তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে।" এটি হচ্ছে হাসান হাদীস যা আমি দুই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আদ্-দারেমীর মুসনাদ থেকে উৎকৃষ্ট সনদে উদ্ধৃত করেছি।

ব্যাখ্যা: উত্তম আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: লেনদেন বিষয়ে ইনসাফের পন্থা অবলম্বন করা। চেষ্টা-সাধনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোমলতা অবলম্বন করা। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইহসানের ক্ষেত্রে ত্যাগ করা। ইত্যাদিসহ মুমিনগণের ঐ সকল সিফাতসমূহ, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বিশেষায়িত করেছেন। তিনি সূরা আল আনফালে বলেছেন:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ﴾

"ঈমানদার ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলে তাদের হৃদয় (আল্লাহর ভয়ে) কাঁপতে থাকে। আর যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন সেগুলো তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে। তারা তাদের রবের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে। যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমাদের দেওয়া রিযিক হতে দান করে। তারাই প্রকৃত ঈমানদার"। সূরা আল আনফাল ৮:২-৪।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ
ٱلْأَٰمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ
ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

'তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রূকূকারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। সূরা আত তাওবা ৯:১১২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ
عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ
لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ﴾

আর যারা অনর্থক কথাকর্ম হতে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবেনা। অতঃপর যারা এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার যত্নবান। আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হেফাজত করে। তারাই হবে ওয়ারিশ। সূরা আল মুমিনুন ২৩: ১-১০। তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا﴾

“রহমানের বান্দা ঐ সকল ব্যক্তি, যারা যমীনে ধীরস্থিরভাবে হাঁটে” সূরা আল ফুরকান ২৫: ৬৩। সূরার শেষ পর্যন্ত।

সুতরাং যার নিজের অবস্থা নিজের নিকট অস্পষ্ট, সে যেনো নিজের সত্তাকে এই আয়াতগুলোর সামনে উপস্থাপন করে। এই সকল গুণাবলির অস্তিত্ব পাওয়া গেলে সেটা উত্তম চরিত্রবান হওয়ার নিদর্শন। আর সকল গুণাবলি অনুপস্থিত থাকলে সেটা খারাপ চরিত্রের নিদর্শন। আর এই গুণাবলির কিছু উপস্থিত আর কিছু অনুপস্থিত থাকলে সেটা আংশিক উত্তম চরিত্র ও আংশিক নষ্ট চরিত্রের প্রতি নিদর্শন। সুতরাং এমন ব্যক্তি যেনো উপস্থিত গুণাবলি সংরক্ষণ করা এবং অনুপস্থিত গুণাবলি অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করে। কোনো ধারণাকারী যেনো এই ধারণা না করে যে, উত্তম চরিত্র বলতে শুধুমাত্র কোমল আচরণ, অশ্লীল কর্মসমূহ ও গুনাহ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়। আর যে এটা সাধন করতে পারল, সে তার চরিত্রকে সংশোধন করে নিল। বরং উত্তম চরিত্র হলো তাই, যা আমরা মুমিনদের গুণাবলির আলোচনায় উল্লেখ করলাম।

তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াটাই উত্তম চরিত্র। আর উত্তম চরিত্রের মধ্যে অন্যতম একটি হলো কষ্ট সহ্য করা।

সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে: "একদা একজন গ্রাম্য বেদুঈন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাদর এত জোরে টেনে ধরল, যে চাদরের প্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড়ে চাপ সৃষ্টি করলো। সে বলল: হে মুহাম্মাদ, তোমার নিকট বিদ্যমান আল্লাহর সম্পদ থেকে আমাকে আংশিক দেওয়ার আদেশ দাও। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দৃষ্টি দিলেন। এরপরে তিনি হেসে ফেললেন এবং তাকে আংশিক সম্পদ দান করার আদেশ দিলেন"। সহীহ বুখারী হা/৩১৪৯, সহীহ মুসলিম হা/১০৫৭।

তাঁর বক্তব্য: "আর অপরাধ হলো তাই, যা তোমার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার উদয় ঘটায়। আর উক্ত বিষয়টি মানুষ জেনে যাক এটা তুমি অপছন্দ কর"। অর্থাৎ: এটা এমন বিষয়, যা অন্তরে ঘৃণার জন্ম দেয়। আর এটাই হলো একমাত্র মূলনীতি, যা উত্তম কাজকে অপরাধমূলক কাজ থেকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তাহলে অপরাধ হলো: যা অন্তরে দুশ্চিন্তার উদ্ভব ঘটায়, এবং অপরাধকারী ব্যক্তি এটা অপছন্দ করে যে, তার অপরাধ সম্পর্কে মানুষ অবগত হোক। আর এখানে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য – আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন – হলো: সর্বোত্তম চরিত্রবান ও নেতৃস্থানীয় মানুষজন। উশৃঙ্খল ও বখাটে মানুষ নয়। সুতরাং এটাই হলো অপরাধ। আর এই জন্যই চরিত্রবান ব্যক্তি অপরাধ পরিহার করবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

وجوب لزوم السنة

হাদীস – ২৮: সুন্নাহ পালন করা আবশ্যক

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ."رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ নাজীহ আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে পানি এসে যায়। আমরা নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদেরকে অসীয়ত করুন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে অসীয়ত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়ত করছি; যদি কোনো গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মেনে চলবে, তা দাঁত দিয়ে খুব শক্তভাবে ধরে রাখ; আর নতুন আবিষ্কার বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাকো, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদআত। প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।" সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে হাদীসটি বর্ণিত। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এটা হাসান, সহীহ হাদীস। [হাসান: আবূ দাউদ হা/৪৬০৭ ও তিরমিযী হা/২৬৭৬।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসের কোনো কোনো সনদে বর্ণিত হয়েছে: মনে হচ্ছে এটি একজন বিদায়ী ব্যক্তির শেষ উপদেশ। আপনি আমাদের নিকট কি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে চাচ্ছেন? তখন তিনি বললেন: "আমি তোমাদেরকে এমন একটি উজ্জ্বল শুভ্র পথে প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছি; যেখানে দিন ও রাতের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। এই পথ থেকে একমাত্র ধ্বংসশীল ব্যক্তিই কেবল বিচ্যুত হতে পারে"। সহীহ: মুসতাদারাক হাকীম হা/৩৩১। তার বক্তব্য: এটি একটি গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশ। অর্থাৎ: উপদেশটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং আমাদের অন্তরে দাগ কেটেছে। আমাদের অন্তরসমূহ এই উপদেশের কারণে প্রকম্পিত হয়েছে। অর্থাৎ ভীত হয়েছে। আমাদের চোখে অশ্রু ঝরেছে, যেনো তিনি ভীতিপ্রদর্শন ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্য: "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে, বাধ্যগত হওয়া ও অনুগত হওয়ার ব্যাপারে অসীয়ত করছি"। অর্থাৎ শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে। "যদিও তোমাদের ওপরে কোনো দাসকে আমীর নিযুক্ত হয়"। কোনো কোনো বর্ণনানুসারে: "হাবশী দাস"।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: দাস কখনো শাসক হতে পারে না। কিন্তু তার দ্বারা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে গুরুত্বের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। যদিও বাস্তবে এর কোনো নজীর নেই। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: ''যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পাখির বাসার ন্যায় (অর্থাৎ ছোট আকারে) একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।'' (قطاة) শব্দটির অর্থ হলো তীতির পাখি, কবুতরের ন্যায় মরুভূমির এক প্রকার পাখি। সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১/২৪১। আর তীতির পাখির গর্ত কখনো মাসজিদের সমান হয় না। কিন্তু দৃষ্টান্ত এমন ক্ষেত্রগুলোতে উপস্থাপন করা যায়।

আবার এমনটি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসন কার্যের অবনতি ও উক্ত দায়িত্ব অনুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা হবে মর্মে সংবাদ দিয়েছেন। এমনকি দাসদেরকে নেতৃত্বভার অর্পণ করা হবে। যদি এমনি হয়, তবে তোমরা তাকে মান্য করো এবং তার

আনুগত্য করো। দুইটি অনিষ্টের মাঝে সবচেয়ে সহজতম বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। আর সেটা হলো: শাসনকার্য পরিচালনা করা জায়েয নেই এমন ব্যক্তির নিকট শাসন ব্যবস্থা সোপর্দ করা হলে সেটার ওপরে ধৈর্য ধারণ করা। যাতে করে এটা কোনো বড় ফেতনার দিকে উপনীত না করে। তাঁর বক্তব্য: "নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আমার পরে যে জীবিত থাকবে, অচিরেই সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে"। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম একটি মুজিযাহ। তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে তাঁর জীবনের পরবর্তী সময়ে ঘটবে এমন মতানৈক্য ও অসৎ কাজের প্রাবল্যের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিস্তারে জানতেন। তিনি এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেননি। বরং সাধারণভাবে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এটা তিনি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করেছেন। যেমন: হুযায়ফা ও আবূ হুরায়রা রদ্বীয়াল্লাহ আনহুমা। আর এই বিষয়টি উভয় সাহাবীর উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রতীক।

তাঁর বক্তব্য: "তখন তোমাদের জন্য আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা জরূরী"। সুন্নাহ হলো: এমন প্রতিষ্ঠিত পন্থা, যা প্রচলিত রাস্তার ওপর দিয়ে চলমান, যেই রাস্তাটি সুস্পষ্ট। "আর খুলাফায়ে রাশিদীন এর সুন্নাহকে" অর্থাৎ যারা হেদায়েতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা হলেন সর্বসম্মতিক্রমে চারজন: আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহর ওপরে অবচল থাকার আদেশ দিয়েছেন দুইটি কারণে: এক: বিশ্লেষণে সক্ষম নন এমন ব্যক্তির তাকলীদের জন্য। দুই: সাহাবীদের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশিদীন এর মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করার জন্য।

তাঁর বক্তব্য: "তোমাদেরকে যাবতীয় নব উদ্ভাবিত বিষয়াদি থেকে সতর্ক করছি"। জেনে রাখো, নব উদ্ভাবিত বিদআত দুই প্রকার: এমন বিদআত, যার কোনো ভিত্তি শরীআতে নেই। এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও

নিন্দনীয়। আরেকটি নব উদ্ভাবিত বিষয় হলো: একটি বিষয়ের বিধানকে তারই সমজাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এটা নিন্দনীয় নয়।

যেহেতু "আল মুহদাস" এবং "আল বিদ'আহ" শব্দ দুইটি শুধুমাত্র নামের কারণেই নিন্দনীয় হতে পারে না। বরং সুন্নার বিপরীত বিষয় এবং পথভ্রষ্টতার কার্যকারণ তাতে বিদ্যমান থাকার কারণেই নিন্দনীয় হয়। শব্দ দুইটি স্বাভাবিকভাবে নিন্দনীয় হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তাদের নিকট যখন রহমানের পক্ষ থেকে কোনো নতুন উপদেশ আসে"। সূরা আল আম্বিয়া ২১:২।

উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "এটি কতইনা উত্তম বিদআত"। অর্থাৎ তারাবীহ। সহীহ বুখারী হা/২০১০। আর নাওয়াজিয দ্বারা সর্বশেষ মাড়ির দাঁতগুলো উদ্দেশ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ما يدخل الجنة

হাদীস – ২৯: যা জান্নাত লাভের সহায়ক

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي مِنْ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّك عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " حَتَّى بَلَغَ "يَعْمَلُونَ"، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُك بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْت: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُك بِمَلَاكِ ذَلِكَ

كُلِّهِ؟ فقُلْت: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْك هَذَا. قُلْت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْك أُمُّك وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ –أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ– إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟. "! رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বললেন: তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ যার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, রমযানে সিয়াম রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? সিয়াম হচ্ছে ঢাল, সাদাকা গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোনো ব্যক্তির গভীর রাতের সালাত।

তারপর তিনি পড়েন: تتجافى جنوبهم عن المضاجع হতে يعلمون পর্যন্ত। ‘তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না।’ [সূরা আস্-সাজদাহ্: ১৬-১৭]

তিনি আবার বলেন: আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া বলবো কি? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন: কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলবো না? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন: এটাকে সংযত কর।

আমি জিজ্ঞেস করি: হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি? তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! জিভের উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে? সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: এটা হাসান, সহীহ হাদীস। [সহীহ: তিরমিযী হা/২৬১৬।]

ব্যাখ্যা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "নিঃসন্দেহে তুমি একটি মহান বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য এটা সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটা নিতান্তই সহজ"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দিয়েছেন। এরপর সে অনুসারে দীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত পালনের দিশা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে একমাত্র তাঁরই জন্য ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন। এরপরে বলেছেন: "সালাত কায়েম কর"। সালাত কায়েম করার অর্থ হলো: সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা। এরপরে ইসলামের যাবতীয় শারঈ নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ।

এরপরে বলেছেন: "আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথের দিশা দিব না? সিয়াম হলো ঢাল স্বরূপ। এখানে সিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: রমযান ব্যতীত অন্য মাসের সিয়াম। যেহেতু রমযান মাসের সিয়ামের কথা পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: অধিক হারে সিয়াম রাখা। جنة — শব্দটির অর্থ ঢাল বা বর্ম। অর্থাৎ সিয়াম তোমার জন্য আবরণ হবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ সাব্যস্ত হবে। এরপরে তিনি বলেছেন: "দান গুনাহের আগুন নিভিয়ে দেয়"। এখানে দান দ্বারা যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান উদ্দেশ্য করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন:

"গভীর রাতে কোনো ব্যক্তির সালাত আদায়"। এরপরে তিনি তেলাওয়াত করেছেন:

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

"যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকে। যারা তাদের রবকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকতে থাকে এবং আমাদের প্রদত্ত রিযিক থেকে তারা দান করে। কোনো ব্যক্তি জানে না যে, তাদের জন্য চক্ষুশীতল করে দেওয়া কী মনোরম বস্তু প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যা তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হবে"। সূরা আস সাজদাহ ৩২:১৬-১৭

কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার রাত্রে সালাত প্রতিষ্ঠাকারীদের ব্যাপারে গর্ব করে বলেন: "তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি তাকিয়ে দেখো, তারা অন্ধকার রাত্রে এমন স্থানে দাঁড়িয়ে আমার ইবাদত করছে, যে তাদেরকে আমি ব্যতীত অন্য কেউ দেখতে পাবে না। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি তাদের জন্য আমার সম্মানের বাড়ি (জান্নাত) বৈধ করে দিলাম"।

এরপরে তিনি বলেছেন: "আমি কি তোমাকে দীনের চূড়া সম্পর্কে বলব না"? শেষ পর্যন্ত। তিনি দীনকে পুরুষ উটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর ইসলামকে এই দীনের চূড়া অর্থাৎ মাথার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোনো প্রাণী মাথা বিহীন বাঁচতে পারে না। এরপরে বলেছেন: "আর এই দীনের খুঁটি হলো সালাত"। কোনো বস্তুর খুঁটি হলো, স্বাভাবিকভাবে খুঁটি বিহীন থাকতে পারে না এমন বস্তুকে প্রতিষ্ঠিতকারী স্তম্ভ। তাঁর বক্তব্য: "আর এই দীনের শীর্ষচূড়া হলো জিহাদ"। কোনো বস্তুর শীর্ষচূড়া হলো ঐ বস্তুর সর্বোচ্চ চূড়া। উটের কূঁজের চূড়া হলো: তার কূঁজের শীর্ষস্থান। আর জিহাদকে কোনো আমলই পুনঃস্থাপন করতে পারে না। যেমনটি আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: একদা একজন ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন:

“আমাকে জিহাদের সমপর্যায়ের কোনো আমলের কথা বলে দিন। তিনি বললেন: আমি এমন কোনো আমল দেখছি না”। এরপরে বললেন: “যখন কোনো মুজাহিদ রওনা দেয়, তুমি কি পারবে তোমার মাসজিদে প্রবেশ করে বিশ্রাম না নিয়ে বিরতিহীন সালাত আদায় করতে এবং ইফত্বারি না করে বিরতিহীন সিয়াম রাখতে? তখন সেই ব্যক্তি বলল: এমনটি কে করতে পারবে”?

তাঁর বক্তব্য: “আমি কি তোমাকে এই সব কিছুর মূলভিত্তি সম্পর্কে বলব না”? আমি বললাম: অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল। তিনি বলেন: তখন তিনি স্বীয় জিহবা মুবারক আঁকড়ে ধরলেন। এরপরে বললেন: “তুমি নিজের এই অঙ্গটিকে সংযত রাখো”। শেষ পর্যন্ত। প্রথমে তাকে কুফরের বিপক্ষে জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন। এরপরে উক্ত জিহাদকে বড় জিহাদের দিকে স্থানান্তরিত করলেন। আর সেটা হলো জিহাদুন নাফস। নিজ সত্তাকে এমন বিষয়ে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত রাখা, যা তাকে কষ্ট দেয় এবং তার বিনাশ ঘটায়। কারণ, তিনি অধিকাংশ মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বাকযন্ত্রকে ধার্য করেছেন। তিনি বলেছেন: “তোমার মাতা তোমাকে হারিয়ে ফেলবে হে মু‘আয, মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে অধোমুখী করে – অথবা তিনি বলেছেন: তাদেরকে উপুড় করে নাকে খত দিয়ে – একমাত্র তাদের জিহবার কর্তিত ফসল”। আর মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীসে পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে”। সহীহ বুখারী হা/৬৪৭৫। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

“যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা জিহ্বা এবং দুই বাহুর মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা আমাকে দিতে

পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারব”। সহীহ বুখারী হা/৬৪৭৪।

حقوق الله تعالى

হাদীস – ৩০: আল্লাহর হক

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بن نَاشِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ."حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَغَيْرُهُ .

আবূ সালাবাহ আল-খুশানী জুরসূম ইবনে নাশিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা ফরযসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, তা অবহেলা করো না। তিনি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। তিনি কিছু জিনিস হারাম করেছেন, তা অমান্য করো না। তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন-তোমাদের জন্য রহমত হিসেবে; ভুলে গিয়ে নয়- সেসব বিষয়ে বেশি অনুসন্ধান করো না।" হাদীসটি হাসান, আদ্-দারা কুতনী ও অন্যান্য কয়েকজন বর্ণনা করেছেন। [যঈফ: দারাকুতনী হা/১৮৪, তাবারানী হা/৫৮৯।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: “আল্লাহ তা‘আলা ফরয করেছেন” অর্থাৎ ওয়াজিব করেছেন এবং বাধ্যতামূলক করেছেন। তাঁর বক্তব্য: “সুতরাং তোমরা এই সীমানাসমূহ লংঘন করো না”। অর্থাৎ উক্ত সীমানায় প্রবেশ করো না। আর আল্লাহ তা‘আলা চুপ থেকেছেন এমন বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন:

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ.

"আমি যেই বিষয়ে নীরব থেকেছি, সেই বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একমাত্র তাদের অধিক প্রশ্ন এবং তাদের নবীগণের বিষয়ে তাদের মতানৈক্যই ধ্বংস করেছে"। সহীহ বুখারী হা/৭২৮৮, সহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭

কোনো কোনো আলেম বলেছেন: বনী ইসরাঈল বেশি পরিমাণে প্রশ্ন করত এবং তাদেরকে উত্তরের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হতো। তাদের চাহিদা সঠিকরূপে পূর্ণ করা হতো। এক পর্যায়ে তাদের অধিক প্রশ্ন ও চাহিদা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল। আর সাহাবীগণ — রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম — বিষয়টি বুঝতে পেরে একান্তই প্রয়োজনীয় না হলে প্রশ্নের ব্যাপারে নিজেদেরকে সংযত রাখতেন। তারা আশ্চর্য হতেন এটা দেখে যে, গ্রাম্য বেদুঈনরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছে এবং তারা সেগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং সংরক্ষণ করতেন। এমনকি এই বিষয়ে একদল অতিরঞ্জিত করে বলেছে: সাময়িক পরিস্থিতি সংক্রান্ত মাসআলাগুলোতে আলেমদেরকে ততক্ষণ প্রশ্ন করা যাবে না, যতক্ষণ সেটা না ঘটে। সালাফগণ এমন বিষয়ে বলতেন: এমন বিষয় না ঘটা পর্যন্ত আলোচনা থেকে বিরত থাকো। তবে আলেমগণ যখন ইলম (জ্ঞান) বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলেন, তখন তারা বিভিন্ন মাসআলার মূলনীতি এবং শাখানীতি প্রণয়ন করলেন। সেগুলোকে সুবিন্যাস্ত করলেন এবং কলমের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করলেন।

শরীআতের বিধান আসার পূর্বে কোনো বস্তুর বিধানগত অবস্থান কী হবে সেই বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন: এমন বিষয়সমূহ কি শরীআত আসার পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল, নাকি বৈধ ছিল। এমন বিষয়ে কি নীরবতা অবলম্বন করতে হবে? তিনটি মাযহাবই প্রচলিত। এই বিষয়টি উসূলের গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে।

الزهد الحقيقي

হাদীস — ৩১: প্রকৃত দুনিয়াবিমুখতা

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّك اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّك النَّاسُ. " حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আস্-সা'ইদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন, লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবেন।

তখন তিনি বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। হাসান হাদীস। ইবনে মাজাহ ও অন্যরা উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। [খুবই যঈফ: ইবনে মাজাহ, হা/৪১০২।]

ব্যাখ্যা: জেনে রাখো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে স্বল্পতা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে ত্যাগী হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর বলেছেন:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে জীবন যাপন করো, যেনো তুমি একজন ভিনদেশী অথবা পথচারী”। সহীহ বুখারী হা/৬৪১৬, সুনানে তিরমিযী হা/২৩৩৩। তিনি আরো বলেছেন:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

"দুনিয়ার ভালোবাসা সকল অপরাধের মূল"। যঈফ: জামে সগীর হা/৬৪২৮

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয় দুনিয়া ত্যাগী ব্যক্তি তার অন্তরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি তার অন্তরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ক্লান্তিতে রাখে"। জেনে রাখো, দুনিয়াতে অবস্থানকারী ব্যক্তি একজন মেহমান মাত্র। আর তার হাতে থাকা সম্পদ সাময়িক উপভোগ্য সম্পদ মাত্র। আর মেহমান হলেন একজন চলমান যাত্রী। আর উপভোগ্য সম্পদ ফেরতযোগ্য। আর দুনিয়া হলো একটি বিদ্যমান পাত্র, যেখান থেকে সৎ অসৎ সকলেই খাবার গ্রহণ করছে। দুনিয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিকট ঘৃণ্য। আর দুনিয়ার প্রেমিকদের নিকট পছন্দনীয়। সুতরাং যে উক্ত প্রেমাস্পদে প্রেমিকদের অংশীদার হবে, তার প্রতি তারা রাগ করবেই। আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে যুহদের (দুনিয়ার ব্যাপারে অনীহা) মাধ্যমে দুনিয়া পরিত্যাগের পথ দেখিয়েছেন। আর উক্ত ত্যাগের বিনিময়ে তিনি তার সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টির অঙ্গীকার করেছেন। আর তাকে অন্য মানুষের হস্তগত সম্পদের ব্যাপারে অনাগ্রহীতার পথ দেখিয়েছেন, যদি সে মানুষের ভালোবাসা কামনা করে। সম্পদ হলো দুনিয়ার ভালোবাসান মূল। কারণ, মানুষের নিকট একমাত্র দুনিয়া ব্যতীত পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও রাগ করার আর কোনো কারণ নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

"আখিরাত যার সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হবে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল বিষয়কে ঐক্যবদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। তার স্বচ্ছলতাকে তার অন্তরে স্থাপিত করে দিবেন। তার নিকট দুনিয়া নগণ্য মনে হবে। আর দুনিয়া যার সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হবে, আল্লাহ তা'আলা তার ঐক্যবদ্ধ বিষয়কেও বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। তার দরিদ্রতাকে তার দুই চোখের সামনে স্থাপন করে দিবেন। আর দুনিয়া তার নিকট ততটুকুই আসবে, যতটুকু তার ভাগ্যে লিখিত আছে"। সহীহ: তিরিমিযী হা/২৪৬৫।

সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর অবিনশ্বর জিন্দেগীকে অশেষ কষ্টে ভরপুর নশ্বর জিন্দেগীর ওপরে অগ্রাধিকার দিবে।

لا ضرر ولا ضرار

হাদীস – ৩২: ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়সন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. "

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

আবু সাঈদ সাদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।"

হাদীসটি হাসান। এটিকে ইবনে মাজাহ, আদ্-দারা-কুতনী এবং অন্যান্যগণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে একে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদের মধ্যে যে আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া নিজের পিতা হতে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি আবু সাঈদকে বাদ দিয়েছেন। তবে হাদীসটির আরো বহু বর্ণনায় এসেছে যার কোনো কোনোটি অপর কোনো কোনোটির দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। [হাসানঃ ইবনে মাজাহ, হা/২৩৪০, আদ্-দারা-কুতনী হা/২২৮।]

ব্যাখ্যাঃ জেনে রাখো, যে ব্যক্তি তার ভাইকে কষ্ট দিল, সে তার প্রতি জুলুম করলো। আর জুলুম নিঃসন্দেহে হারাম কাজ। যেমনটি আবূ যর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিবাহিত হয়েছেঃ

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"হে আমার বান্দাগণ, নিশ্চয় আমি নিজের ওপরে জুলুমকে হারাম করেছি এবং জুলুমকে তোমাদের মাঝেও হারাম সাব্যস্ত করেছি। বিধায়, তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না"। সহীহ মুসলিম হা/২৫৭৭।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"নিশ্চয় তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত-আবরূ তোমাদের ওপরে হারাম। মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৯৬৬, সহীহ লি গাইরিহী

আর তাঁর এই বক্তব্যঃ "নিজের কোনো অনিষ্ট করা যাবে না এবং অপরেরও কোনো অনিষ্ট সাধন করা যাবে না" এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেনঃ শব্দদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও অর্থ একই। উভয় শব্দদ্বয় তাগীদের অর্থে ব্যবহার করেছেন।

ইবনু হাবীব বলেছেন: আরবী ভাষাবিদদের নিকট ضرر — শব্দটি একটি বিশেষ্য তথা নাম। আর ضرار — শব্দটি ক্রিয়াবাচক শব্দ। সুতরাং لاضرر — শব্দের অর্থ হলো: কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে এমন কোনো অনিষ্টসাধন করতে পারবে না, যা সে নিজের ক্ষেত্রে করতে পারে না। আর لاضرار — শব্দের অর্থ হলো: কেউ যেনো অপর ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন না করে।

মুহাসিনী বলেছেন: ضرر — হলো এমন কার্যক্রিয়া, যার ফলে তোমার উপকার হয়। আর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষতি হয়। আর এটা একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। কেউ কেউ বলেছেন: ضرر — ও ضرار — শব্দ দুইটি যথাক্রমে قتل — ও قتال — শব্দদ্বয়ের ন্যায়। সুতরাং ضرر শব্দের অর্থ হলো: এমন ব্যক্তির ক্ষতি করা, যে তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। আর ضرار — শব্দের অর্থ হলো: তোমার ক্ষতি করেছে এমন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন। তবে সেটা সাম্যতা এবং ন্যায় পন্থার ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে সম্পন্ন করা।

আর এটা যেনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ন্যায়:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"তুমি তোমার আমানতকে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দাও, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে। আর তোমার সঙ্গে খেয়ানতকারীর আমানতের খেয়ানত করো না"। সহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৫৩৫, তিরমিযী হা/১২৬৪।

কোনো কোনো আলেমদের মতে এই কথার অর্থ হলো: তোমার সঙ্গে খেয়ানতকারী থেকে তোমার খেয়ানতের প্রতিশোধ নেওয়ার পরেও তার

প্রতি তুমি খেয়ানত করো না। যেনো নিষেধাজ্ঞা শুরুতেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর যে ব্যক্তি আঘাতের বিনিময়ে সমপরিমাণ আঘাত দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো এবং তার অধিকার আদায় করে নিল, সে খেয়ানতকারী নয়। বরং খেয়ানতকারী ঐ ব্যক্তি, যে তার মালিকানা বহির্ভূত সম্পদ দখল করেছে অথবা তার মালিকানাধীন সম্পদের চাইতেও অধিক সম্পদ দখল করেছে।

ফকীহগণ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন, যে নিজের ঋণের দায়কে অস্বীকার করেছে। পরবর্তীতে পাওনাদার ব্যক্তি যদি অস্বীকারকারীর আমানতের সম্পদ দখল করে নেয়, যা ঋণী ব্যক্তি তার নিকট আমানত রেখেছিল। তাহলে এই ক্ষেত্রে কোনো কোনো আলেম বলেছেন: তার জন্য উক্ত ঋণী ব্যক্তির অধিকার দখল করার অনুমতি নেই। যার দলীল হলো তাঁর এই বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ: "তুমি আমানত সঠিকভাবে আদায় (পরিশোধ) করো এবং তোমার সাথে খেয়ানতকারীর প্রতি তুমি খেয়ানত করো না"।

অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: "তার জন্য নিজের হাতে থাকা উক্ত সম্পদ থেকে নিজের হক গ্রহণ করা জায়েয হবে। তারা আবূ সুফয়ানের সঙ্গে হিনদের কার্যকলাপের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আয়িশার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এই মাসআলায় ফকীহগণের অসংখ্য মত ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান। এটা সেই মাসআলাগুলোর আলোচনাস্থল নয়। বিশ্লেষণে যেই মতটি সঠিক মনে হয়, সেটা হলো:

কারোর জন্যই তার ভাইয়ের ক্ষতিসাধন করা জায়েয নেই। চাই তার কেউ করুক অথবা না করুক। তবে তার জন্য সামর্থ থাকার শর্তে ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু তার প্রাপ্য হয়, ঠিক ততটুকু সে গ্রহণ করতে পারবে। এটা জুলুম বা ক্ষতিসাধন বলে বিবেচিত হবে না। যদি এটা সুন্নাহ অনুমোদিত পন্থায় সংঘটিত হয়।

শায়খ আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "দারাকুতনী এই হাদীসটিকে অনেকগুলো সনদে বর্ণনা করেছেন। একত্রিতরূপে সকল সনদ হাদীসটিকে শক্তিশালী ও হাসান পর্যায়ে উন্নীত করে। অধিকাংশ আলেম হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং সেটা দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আবূ দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেছেন: ফিকহ পাঁচটি হাদীসের ওপরে ভিত্তিশীল। এই হাদীসটিকে তিনি উক্ত হাদীসগুলোর মাঝে গণ্য করেছেন। শায়েখ বলেছেন: সুতরাং আবূ দাউদ কর্তৃক ভিত্তিশীল পাঁচটি হাদীসের মাঝে এই হাদীসটিকে গণ্য করা এবং উক্ত হাদীসের ব্যাপারে তার মন্তব্য এই কথার জানা দিচ্ছে: হাদীসটি তার দৃষ্টিতে দুর্বল নয়। তিনি এই বিষয়ে বলেছেন: এটা ضرار – ও قتال – শব্দের ন্যায়। যা مفاعله – বাব থেকে নির্গত। এই শব্দটি অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস ضاد – অক্ষরের পূর্বে যের বিশিষ্ট همزة – সহকারে পড়েছেন। তবে এটার সঠিকতার পক্ষে কোনো দলীল নেই।

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

হাদীস – ৩৩: দাবি করলে প্রমাণ দিবে, আর অস্বীকার করলে শপথ করবে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . "حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ ."

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবি অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা অন্যের সম্পদ ও জীবন দাবি করে বসবে। তবে নিয়ম হচ্ছে দাবিদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে। এ হাদীসটি হাসান। এটাকে বায়হাকী ও অন্যান্যগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর কিছু অংশ সহীহ হাদীসের অনুরূপ। [সহীহ বুখারী হা/৪৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১১, বায়হাকী, হা/২১২০০।]

ব্যাখ্যা: সহীহাইনে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: ইবনু আবী মুলাইকা বলেছেন: ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা লিখেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তা বিবাদী পক্ষের জন্য অবধারিত"। অপর বর্ণনায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি মানুষকে তাদের (দলীল বিহীন) দাবি অনুসারে সব কিছু দেওয়া হয়, তাহলে একদল মানুষ আরেক দল মানুষের জীবন ও তাদের সম্পদের ব্যাপারে দাবি করতে শুরু করবে। তবে দায়মুক্ত করার জন্য শপথ করা বিবাদী পক্ষের ওপর অবধারিত"।

আল আরবাঈন গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। এভাবেই বর্ণনাটি সুনান ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখকগণ সংকলন করেছেন। আসীলী বলেছেন: এই হাদীসটিকে মারফূ' বিবেচনা করা সহীহ নয়। এটা ইবনু আব্বাসের একটি মত।

লেখক বলেছেন: যদি হাদীস শাস্ত্রের দুই মহান ইমাম (বুখারী ও মুসলিম) এর সাক্ষ্য অনুসারে এটাকে মারফূ' বলা সহীহ হয়, তাহলে এটাকে মাওকূফ বলে কেউ এর মান খর্ব করতে পারবে না। আর এমন ক্ষেত্রে এটা বৈপরীত্য বা ইযত্বিরাব বলে বিবেচিত হবে না। এই হাদীসটি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি এবং কলহ-বিবাদ সুরাহার সবচেয়ে বড় একটি উৎস। হাদীসটির দাবি হলো, কারোর পক্ষে শুধুমাত্র তার দাবির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত করা যাবে না।

তাঁর বক্তব্য: "একদল মানুষ আরেক দল মানুষের জীবন ও তাদের সম্পদের ব্যাপারে নিজেদের অধিকারের দাবি করতে শুরু করবে"। এই বক্তব্য দ্বারা কিছু মানুষ "অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে অথবা অমুক ব্যক্তি আমার হত্যার ব্যাপারে দায়বদ্ধ" মর্মে নিহত তথা মুমূর্ষ ব্যক্তির মত মানার পক্ষে ইমাম মালিকের এই মতটি বাতিল হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির এই বক্তব্য "অমুক ব্যক্তির নিকট আমার এক দীনার বা এক দিরহাম মুদ্রা পাওনা রয়েছে" গ্রহণ করা হবে না।

সুতরাং "আমার হত্যার ব্যাপারে অমুক ব্যক্তি দায়বদ্ধ" মর্মে মূমুর্ষ ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার আরো অধিক উপযুক্ত। এই হাদীসে ইমাম মালিকের বিপক্ষে এই বিষয়ে তাদের কোনো দলীল নেই। কারণ, তিনি দাবিদার তথা বাদী পক্ষের দাবির মাধ্যমে কিসাস বা দিয়াতের বিধান সাব্যস্ত করার মত দেননি। বরং তিনি এর দ্বারা হত্যার সামগ্রিক শপথ সংক্রান্ত একটি বিধান সাব্যস্ত করেছেন। তিনি মুমূর্ষ ব্যক্তির "আমার হত্যার ব্যাপারে অমুক ব্যক্তি দায়বদ্ধ" এই বক্তব্যকে বাদী পক্ষের দলীলের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী সাব্যস্তকারী একটি বাহ্যিক প্রমাণ ধার্য করেছেন মাত্র। যাতে করে তারা (নিহত ব্যক্তির আত্মীয় পক্ষ) শুধুমাত্র শপথের দ্বারাই দায়মুক্তি লাভ করতে পারে। ঠিক ক্বাসামার অন্যান্য বাহ্যিক প্রমাণগুলোর ন্যায়। তাঁর বক্তব্য: "কিন্তু বিবাদী পক্ষের ওপরে শপথ অনিবার্য"।

আলেমগণ সম্পদের ক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষের শপথ করার আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: কোনো ব্যক্তির অধিকার, তালাক, বিবাহ অথবা গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিবাদীর ওপরে শপথ করা ওয়াজিব। যা এই হাদীসটির বাহ্যিক সামষ্টিক অর্থ থেকে বুঝা যায়। যদি সে (বিবাদী) হলফ করতে অস্বীকার করে, তাহলে দাবিদার শপথ করবে এবং তার দাবি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তালাক, বিবাহ ও গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে বিবাদীর হলফ নেওয়া হবে। যদি সে হলফ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সকল দায়ভার তার ওপরে বর্তাবে। তিনি বলেছেন: হদ্দসমূহের ক্ষেত্রে হলফ নেওয়া হবে না।

النهي عن المنكر من الإيمان

হাদীস – ৩৪: **অন্যায়ের নিষেধ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . "رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম, হা/৪৯।]

ব্যাখ্যা: ইমাম মুসলিম ত্বারিক্ব বিন শিহাব এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: “সর্ব প্রথম ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুতবার প্রচলনকারী হলেন মারওয়ান। মারওয়ান এমনটি করার সময় সেখানে উপস্থিত একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতে হয়। তখন সে বলল: এই নিয়মটি এখন পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আবূ সাঈদ বললেন: শুনে রাখো, এই ব্যক্তি তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করেছে। আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: (তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তাহলে সে যেনো উক্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে .... শেষ পর্যন্ত)"। এই হাদীসটিতে এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, এই কাজটি মারওয়ানের পূর্বে অন্য কেউ করেনি।

যদি কেউ বলে: আবূ সাঈদ কেনো এই অন্যায় কাজে বাধা প্রদানে এতটুকু দেরী করলেন যে, এর ফলে এই ব্যক্তি উক্ত কাজটি করার সুযোগ পেলো? তাহলে উত্তরে বলা হবে: সম্ভবত আবূ সাঈদ খুতবা সালাতের পূর্বে উপস্থাপন করার প্রথম পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন না। উক্ত ব্যক্তি মারওয়ানের এই কাজটির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানানোর পরে উভয়ের কথোপকথন চলাকালে আবূ সাঈদ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। অথবা হয়তো তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিজের ব্যাপারে তার এই ভয় ছিল যে, তিনি বিষয়টির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে তার অস্বীকৃতির ফলে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তিনি অস্বীকৃতির দায় থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। অথবা বিষয়টি এমনও হতে পারে যে, আবূ সাঈদ অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লোকটি তার সামনেই তার পূর্বে কাজটি সাধন করেছে। আর তখন তিনি লোকটিকে শক্তি যুগিয়েছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

অপর একটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যেই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই সালাতুল ঈদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: আবূ সাঈদই হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি মারওয়ানের হাত টেনে ধরেছেন। যখন মারওয়ান মিম্বারে উঠার চেষ্টা করে। তারা উভয়ে একত্রেই ছিলেন। তখন মারওয়ান তাকে সেই উত্তরটিই দেয়, যা সে উক্ত ব্যক্তিকে দিয়েছিল। সুতরাং হতে পারে উভয়টি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। আর তাঁর বক্তব্য: "সে যেনো বাধা প্রদান করে"। এটা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব অর্থবোধক আদেশ। কখনো কিতাব ও সুন্নাহ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি অপরটির সমার্থবোধক হয়। এটাও একটি নসীহা তথা কল্যাণমূলক কর্ম, যা মূলত দীন।

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “তোমাদের জন্য নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক। যদি তোমরা হেদায়েতের পথে অবিচল থাকো, তাহলে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না”। সূরা আল মায়িদা ৫:১০৫।

আমাদের পূর্ববর্তী দাবির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, মুহাক্কিক্বগণের মতে সহীহ মত অনুসারে এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা হলো: যখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করবে, তখন অন্যদের ব্যর্থতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “একজন বোঝা বহনকারী অপরজনের বোঝা বহন করবে না”। সূরা আল আনআম ৬:১৬৪।

আর যখন বিষয়টি এমনি হবে, তখন একজন মুসলিম কীসের ভিত্তিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। আর যখন সে এই দায়িত্ব পূরণ করবে, কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি তা মানবে না, তখন তাকে আর নিন্দা করা যাবে না। কারণ, তার দায়িত্ব শুধুমাত্র সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। উক্ত আদেশ নিষেধ কবুল করানো বা মানানো নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এরপরে কথা হলো: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি ফরযে কিফায়া পর্যায়ের আমল। যখন যথেষ্ট পরিমাণ ব্যক্তি এটা কায়েম করবে, তখন অন্যান্যদের দায়িত্ব থেকে এটা বাদ পড়ে যাবে। আর যদি সকলেই আমলটি পরিত্যাগ করে, তাহলে যারা কোনো সমস্যা ব্যতীতই কাজটি করতে সক্ষম ছিল, তাদের সকলেরই গুনাহ হবে। আবার কখনো কখনো এটা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট অনুসারে নির্ধারিতও হয়ে যায়। যেমন: ফরযে কিফায়া জাতীয় আমল এমন কোনো স্থানে প্রতিষ্ঠা করার প্রেক্ষাপট তৈরি হলো, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা অন্য কারোর পক্ষে উক্ত আমলটি সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর যেমন: কোনো ব্যক্তি তারই নিজের স্ত্রীকে অথবা সন্তানকে অথবা নিজের দাসকে কোনো অসৎ কাজ করতে দেখল এবং নিজ দায়িত্ব পূরণে অবহেলা করলো।

আলেমগণ বলেছেন: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর দায়বদ্ধতা কখনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির দায় থেকে “তা মানা হবে না” এই অযুহাতের ভিত্তিতে মুক্ত হয় না। বরং তার ওপরে উক্ত দায়িত্ব পূরণ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “আপনি সদুপদেশ দিতে থাকুন, কারণ, তা মুমিনদের উপকারে আসবে”। সূরা আয যারিআত ৫১:৫৫।

আর ইতোপূর্বেই এই বিষয়টি অতিবাহিত হয়েছে যে, তার ওপরে শুধুমাত্র আদেশ ও নিষেধের দায়িত্ব। তার ওপরে মানানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “রসূলের ওপরে একমাত্র পৌঁছে দেওয়া পর্যন্তই দায়িত্ব”। সূরা আল মায়িদা ৫: ৯৯।

আলেমগণ বলেছেন: সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারীকে সম্পূর্ণ কামেল হওয়া জরূরী নয়। তার আদেশ সম্বলিত কাজটি পূর্ণরূপে মান্যকারী ও নিষেধ সম্বলিত কাজটি থেকে পূর্ণরূপে পরিহারকারী হওয়া জরূরী নয়। বরং তার জন্য আদেশ দেওয়া জরূরী, যদিও সে উক্ত কাজের খেলাফ কোনো কর্মে লিপ্ত থাকে। কারণ, তার ওপরে দুইটি বিষয় পালন করা ওয়াজিব: নিজেকে আদেশ ও নিষেধ করা এবং অপর ব্যক্তিকে আদেশ ও নিষেধ করা। যদি সে দুইটি কাজের কোনো একটিকে গ্রহণ করে, তাহলে তার থেকে অপরটির দায়িত্ব রহিত হবে না। তারা বলেছেন: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট হয় না। বরং এটা সাধারণ ব্যক্তি মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঐ কাজেই আদেশ ও নিষেধ করতে পারে, যেই কাজের ব্যাপারে সে জ্ঞান রাখে। যদি বিষয়টি সালাত, সিয়াম, যিনা, মদ পান ইত্যাদি স্পষ্টজাতীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সকল মুসলিম ব্যক্তিই এই বিষয়ে আলেম। আর যদি বিষয়টি সূক্ষ্ম কাজ ও কথার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইজতিহাদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় হয় এবং উক্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোনো দখল না

থাকে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেটা অস্বীকার করা বা বাধা দেওয়ার সুযোগ নেই। বরং সেই বিষয়টি আলেমদের দায়বদ্ধতার অধীনে।

আর আলেমগণ একমাত্র ইজমা পূর্ণ বিষয়েই বাধা দিতে পারেন। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে তারা বাধা দিতে পারবেন না। যেহেতু দুইটি মতের একটি অনুসারে প্রত্যেক মুজতাহিদ ব্যক্তিই সঠিক। এই মতটি অনেক মুহাক্কিক্ব আলেমদের নিকট শ্রেষ্ঠ মত। আর অপর মতানুসারে: মুজতাহিদগণের মাঝে একজনই সঠিক। তবে ভুলকারী আমাদের নিকট চিহ্নিত নয়। আর গুনাহ ভুলকারীর দায় থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নসীহার দৃষ্টিতে মতানৈক্য থেকে বের হয়ে আসাটা উত্তম ও প্রেরণাযোগ্য বিনয়পূর্ণ নেকীর কাজ বলে বিবেচিত।

শায়েখ মুহীউদ্দীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জেনে রাখো, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অধ্যায়টিকে দীর্ঘদিন যাবৎ অধিকাংশ মানুষের দ্বারা এর মহত্বকে অবহেলা করা হয়েছে। আর এই যুগে অল্প কিছু রীতি-রেওয়াজ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ এটা একটি মহান অধ্যায়। যা দ্বারা দীনের ভিত্তি ও অবকাঠামো স্থাপন করা সম্ভব।

আর যখন দুষ্কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন নেককার ও বদকার উভয়কেই শাস্তি গ্রাস করে। আর মানুষ যদি জালেম ব্যক্তির হাতকে আঁকড়ে না ধরে (জুলুম প্রতিহত না করে), তাহলে অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সম্মিলিত শাস্তির আস্বাদন করাবেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেনো তাদের ওপরে আপতিত বিপদ অথবা বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে সাবধান থাকে”।

সুতরাং আখিরাতের অভিযাত্রী এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হলো এই বিষয়টিকে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা। কারণ, এর উপকারিতা অনেক বড়। বিশেষভাবে এর গুরুত্ব প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। তবে এই দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি

যেনো নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে তার উঁচু মর্তবার কারণে ভয় না করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহ তা'আলাকে সাহায্য করবে"। জেনে রাখো, প্রতিদান দেওয়া হয় শ্রম অনুপাতে। আর কেউ যেনো তার বন্ধুত্ব অথবা হৃদ্যতার কারণে এই কাজটি পরিত্যাগ না করে। কারণ, একজন প্রকৃত বন্ধু ঐ ব্যক্তি, যে তার বন্ধুর আখিরাতের উন্নতির চেষ্টা করে। যদিও সেই কাজটা তার বন্ধুর দুনিয়ার স্বার্থকে খর্ব করে। আর প্রকৃত শত্রু হলো ঐ ব্যক্তি, যে তার আখিরাত বরবাদ করা অথবা খর্ব করার চেষ্টা করে। যদিও এর ফলে তার দুনিয়ার কল্যাণ অর্জিত হয়।

আর সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্য কাজটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে করা উচিত, যাতে করে সেটা উদ্দেশ্য পূরণকে অধিক সহজতর করে দেয়।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহু বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ভাইকে গোপনে সদুপদেশ দিল, সে তাকে প্রকৃতপক্ষেই নসীহত করলো এবং তার মর্যাদা রক্ষা করলো। আর যে তাকে প্রকাশ্যে নসীহত করলো, সে তাকে অপমান করলো এবং তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করলো।

এই বিষয়ে মানুষ অন্যতম যেই অবহেলাটি করে থাকে তা হলো: যখন তারা কাউকে কোনো ত্রুটিযুক্ত পশু অথবা পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বিক্রি করতে দেখে, তখন তারা এর বিরোধিতা করে না এবং ক্রেতাকেও উক্ত ত্রুটির কথা বলে না। অথচ তারা এই বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ববান। কারণ, দীন হলো নসীহা। আর যে নসীহা করলো না, সে ধোঁকার আশ্রয় নিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "সে যেনো তার হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। যদি সেটা করতে না পারে, তাহলে যেনো সে তার জিহবা দ্বারা বাধা প্রদান করে। আর যদি সেটাও করতে না পারে, তাহলে যেনো সে নিজ ক্বলব দ্বারা বাধা প্রদান করে"।

এর অর্থ হলো: সে যেনো তার ক্বলব দ্বারা এটাকে অস্বীকার করে। আর এটা করতে কোনো বাধা অথবা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু

বাধা দেওয়া ঐ ব্যক্তির কর্তব্য, যার সামর্থ আছে সেটা করার। তাঁর বক্তব্য: "আর এটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর"। এর অর্থ হলো — আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন — সবচেয়ে কম উপকারী ঈমান।

সৎ কাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্য ধারণার বশবর্তী হয়ে গবেষণা, নিরীক্ষা, গোয়েন্দাবৃত্তি ও ঘরে ঘরে ঢুকে খোঁজ-খবর নেওয়ার অধিকার নেই। বরং সে কোনো অসৎ কাজের ব্যাপারে অবগত হলে উক্ত বিষয়টি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। মাওয়ারদী বলেছেন: তার জন্য ঘরে-দুয়ারে যেয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তবে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে নির্জনে অমুক স্থানে হত্যার ফন্দি করছে। অথবা নির্জনে অমুক মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করছে। তার জন্য এমন অবস্থায় গোয়েন্দাবৃত্তি করা এবং তল্লাশি চালানো জায়েয আছে। অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে পরবর্তীতে এর কোনো প্রতিকার বিধান করার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায়।

তাঁর বক্তব্য: "আর এটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর"। এর অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর বলাটাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে: "এরপরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের অস্তিত্ব নেই"। অর্থাৎ এরপরে আর ঈমানের কোনো স্তর নেই। আর এই হাদীসে ঈমান শব্দটি ইসলামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিহত বা আহত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে বাধা প্রদানের দায়বদ্ধতা তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর এটা সালাফ ও খালাফ এর মধ্যে মুহাক্কিক আলেমগণের মত। অতিরঞ্জনকারী আরেকদলের অভিমত অনুসারে যদি এমন আশঙ্কা থাকেও, তথাপি সে বাধা প্রদানের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

أخوة الإسلام

হাদীস – ৩৫: ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. "رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোনো মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪।]

ব্যাখ্যা: তাঁর বক্তব্য: “তোমরা একে অপরের সঙ্গে হিংসা করো না”। হিংসা হলো: নিআমত বিলুপ্ত হওয়ার আকাঙ্খা। আর এটা হারাম। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “তোমাদেরকে আমি হিংসা থেকে সাবধান করছি। কারণ, হিংসা সকল নেকীকে নিঃশেষ করে দেয়। ঠিক যেরূপে

আগুন জ্বালানিকাঠ বা কাষ্ঠখণ্ডকে নিঃশেষ করে দেয়"। যঈফ: আবূ দাউদ হা/৪৯০৩।

আর ঈর্ষা হলো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সুখ তার থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আশা না করে নিজের ক্ষেত্রেও সেটা অর্জিত হওয়ার আকাঙ্খা করা। আর হিংসাকে ঈর্ষার স্থানে ব্যবহার করা হয় উভয়টির অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকার কারণে। যেমন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "একমাত্র দুইটি বিষয়েই ঈর্ষা করা বৈধ"। মুসলিম হা/৮১৬।

অর্থাৎ (উক্ত বিষয় দুইটি ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে) কোনো ঈর্ষা করা যাবে না। তাঁর বক্তব্য: "তোমরা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একে অপরের দরদামে হস্তক্ষেপ করো না" । نَجش – শব্দটির মূল অর্থ হলো কপটতা। অর্থাৎ ধোঁকা। এই জন্যেই শিকারীকে ناجش – বলা হয়। কারণ, সে শিকারের সঙ্গে কপট আচরণ করে এবং তাকে ফাঁদে আটকানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করে।

তাঁর বক্তব্য: "তোমরা একে অপরের সঙ্গে রাগ করো না" । অর্থাৎ একে অপরের প্রতি রাগ করার উপকরণসমূহকে ব্যবহারিক আচরণে স্থান দিয়ো না। কারণ, ভালোবাসা এবং রাগ আন্তরিক বিষয়। যা মানুষের পক্ষে নিজে থেকে অর্জন করার সামর্থ নেই। এবং সে এই বিষয়গুলোকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারে না।

যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার সাধ্যমত আমি এই বন্টন সম্পন্ন করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ঐ বিষয়ে পাকড়াও করবেন না, যেই বিষয়ে আপনার সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু আমার সক্ষমতা নেই"। (যঈফ: আবূ দাউদ হা/২১৩৪, তিরমিযী হা/ ১১৪০) অর্থাৎ ভালোবাসা ও রাগ। আর تدابر – শব্দের অর্থ হলো: পারস্পরিক শত্রুতা। কেউ কেউ বলেছেন: পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ বা বয়কট করা। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের পিছনে তার দুর্নাম করে।

তোমাদের কেউ যেনো অপর ভাইয়ের বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাঝে নিজে বিক্রি না করে”। অর্থ: “বিক্রেতা ও ক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্রয় চুক্তি অকার্যকর করার অধিকার রাখে” মর্মে চুক্তিতে পণ্য ক্রেতাকে চুক্তির সময় এই কথা বলাঃ তুমি এই ক্রয় চুক্তি এখনি বর্জন করো। আমি তোমাকে একই পণ্য বা এর চাইতেও দামি পণ্য একই মূল্যে বিক্রি করছি। অথবা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে সম্মতিক্রমে একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত হয়েছে এবং তারা উভয়ে উক্ত মূল্যের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। এখন শুধুমাত্র চুক্তি সম্পন্ন করা বাকি আছে। এমন সময় অন্য বিক্রেতার একই মূল্যে আরো বেশি পরিমাণ পণ্য দেওয়া অথবা একই পরিমাণ পণ্য আরো কম মূল্যে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া। আর উভয়ের সম্মতিতে মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পরে এটা হারাম কাজ বলে বিবেচিত হবে। তবে কোনো নির্দিষ্ট মূল্যের ব্যাপারে উভয়ের সম্মতি না হলে সেটা হারাম নয়।

“তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে যাও” বাক্যটির অর্থ হলোঃ সর্বাবস্থায় খাঁটি আন্তরিকতা ও কল্যানকামী মনোভাবের সাথে একে অপরের সঙ্গে ভালোবাসা, হৃদ্ধতা, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব এবং কল্যাণময় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আপন ভাইদের সঙ্গে যেভাবে লেনদেন ও আচরণ করতে হয় ঠিক সেভাবে তোমরা একে অপরের সঙ্গে লেনদেন ও আচরণ করো।

তাঁর বক্তব্য: “একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। যে কখনো তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করতে পারে না। তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। তাকে তুচ্ছ করতে পারে না” । خذلان – শব্দের অর্থ: সহযোগিতা ও সাহায্য পরিত্যাগ করা। এই বাক্যের দাবি হলোঃ যখন কোনো মুসলিম যালিমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বা এই জাতীয় বিষয়ের জন্য অপর মুসলিমের নিকট সাহায্য কামনা করে, তখন তার জন্য অপর মুসলিম ভাইকে সাহায্য করা জরূরী হয়ে যায়। যদি তার সামর্থ থাকে এবং উক্ত সাহায্যের ব্যাপারে শারঈ কোনো আপত্তি না থাকে।

তাঁর বক্তব্য: "সে তাকে তুচ্ছ করতে পারে না" । শব্দটি নুক্বতা বিহীন حاء — ও قاف — দ্বারা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সে অহংকার করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। ক্বাযী 'আয়ায বলেছেন: কেউ কেউ শব্দটির প্রথম অক্ষর ياء — এর ওপরে পেশ এবং নুক্বতা বিহীন خاء — এবং পরের অক্ষরে فاء সহকারে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ: সে তার ভাইয়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারে না। তার শপথ কখনো নষ্ট করতে পারে না। তবে সঠিক হলো প্রথমটি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "তাকওয়া এখানে বিদ্যমান"। এই কথা বলা অবস্থায় তিনি নিজ বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করলেন মোট তিনবার। অপর বর্ণনায়: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক গঠন ও চেহারা সুরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তবে তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন"। অর্থাৎ: বাহ্যিক আমলগুলো তাকওয়া অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকওয়া সংঘটিত হয় অন্তরে বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার মহত্ব, তাঁর ভয় ও তাঁকে নিয়ে গভীর ধ্যান করার দ্বারা। আর আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি — অর্থাৎ তাঁর পর্যবেক্ষণ — সকল বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই কথাটির উদ্দেশ্য — আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন — তাঁর পক্ষ থেকে (বান্দার আমলের) প্রতিদান দেওয়া ও হিসাব নেওয়া। আর এই সকল বিষয়ে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো অন্তর।

তাঁর বক্তব্য: "কোনো মানুষের অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে"। এই হাদীসে এই বিষয়ে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাকে তুচ্ছ মনে করেন না। যেহেতু তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রিযিক দিয়েছেন। এরপরে তাকে একটি সর্বোত্তম গাঠনিক আকার দান করেছেন। তার জন্য আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তুকে বশীভূত করেছেন। যদিও আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু বশীভূতকরণ তার স্বার্থে এবং অন্যদের স্বার্থেও সাধিত হয়েছে। তথাপি

সেখানে তারও প্রাপ্য রয়েছে। এরপরে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে মুসলিম, মুমিন ও বান্দা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি স্বীয় আদেশ তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে তাঁর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার (মুসলিম) নিকট রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে তুচ্ছ করলো, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানিত বস্তুকে তুচ্ছ করলো। আর এটাই তার অন্যায়ের জন্য যথেষ্ট। কারণ, একজন মুসলিমের অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ করার মাঝে অন্যতম হলো: তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম না দেওয়া। আর যদি সে আগে সালাম দেয়, তাহলে তার সালামের উত্তর না দেওয়া। অন্যতম আরেকটি হলো: আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন নাকি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এই বিষয়টি তার ব্যাপারে বিবেচনা না করা। আর মুর্খ ব্যক্তির ওপরে বুদ্ধিমান ব্যক্তির ক্রুদ্ধ হওয়া এবং অন্যায়কারীর প্রতি ন্যায়বান ব্যক্তির ক্রুদ্ধ হওয়াটা কোনো মুসলিমকে তুচ্ছ করা নয়। বরং সে যদি মুর্খকে মুর্খতা ও অন্যায়কারীকে অন্যায়ের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষায়িত করে, তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। যখনি সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট ধারী ব্যক্তি উক্ত বৈশিষ্ট থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তখনি সে তার ভালো গুণের জন্য তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এবং তার উচ্চ মর্যাদার ঘোষণা দিবে।

فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر

হাদীস – ৩৬: কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্বরণের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ

اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبَطْأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ."رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظ .

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য কোনো রাস্তা গ্রহণ করে, তার অসীলায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের ওপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে থাকবে আর আল্লাহ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত। যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছিয়ে পড়বে, তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি অনেকগুলো শাস্ত্র, মৌলিক নীতিমালা ও আদব সম্বলিত মহান একটি হাদীস। এখানে মুসলিমদের সমূহ প্রয়োজন পূরণের মহত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে সম্পদ, অথবা জ্ঞান বিতরণ অথবা কোনো কল্যাণমূলক কাজের দিশা দেওয়া অথবা নসীহত ইত্যাদি প্রদান করার মহত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। বিপদে সান্ত্বনা দেওয়ার অর্থ হলো: বিপদ দূর করা। তাঁর বক্তব্য: “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করলো”। কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করার

অর্থ হলো: তার ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চরিত্রবান ব্যক্তিদের স্বভাব গোপন করা, যাদের দ্বারা অনিষ্টতা প্রসারের কোনো আশঙ্কা নেই। আর এটা হলো ঐ অপরাধ গোপন করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে এবং সেটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আর যদি অপরাধটি এমন হয়, যেই অপরাধের সঙ্গে সে স্থায়ীভাবে জড়িত, তবে তাৎক্ষণিকরূপে তাকে বাধা দিতে হবে এবং তাকে উক্ত অপরাধ থেকে বারণ করতে হবে। যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে বিষয়টিকে শাসকের নিকট উত্থাপন করতে হবে। যদি এর ফলে কোনো ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। সুতরাং কোনো অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তির অপরাধ লুকিয়ে রাখা যাবে না। কারণ, এটা তাকে ফাসাদ, কষ্ট প্রদান, ইজ্জত-আবরু নষ্ট করার প্রতি উৎসাহিত করবে এবং অন্যকেও একই জাতীয় অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস যোগাবে। বরং এমন বিষয়ের মামলা শাসকের নিকট উত্থাপন করাই উত্তম হবে যদি এর দ্বারা কোনো ফাসাদের আশঙ্কা না থাকা।

একইভাবে হাদীসের রাবী, সাক্ষী ও আমানতদারদের দোষ বর্ণনা করাও সাদাকা। ওয়াকফকৃত ও ইয়াতীমদের সম্পদের আমানতদারগণও এই জাতীয় ব্যক্তিদের মতই সমালোচনার যোগ্য। সুতরাং প্রয়োজনের সময় তাদের সমালোচনা (দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা) করা ওয়াজিব। এটা নিষিদ্ধ গীবত বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটা ওয়াজিব নসীহত বলে গণ্য হবে। তাঁর বক্তব্য: "আল্লাহ তাঁর বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ পর্যন্ত লিপ্ত থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে"। এই সংক্ষেপিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা একমাত্র এই পরিস্থিতিই করতে পারে, যখন কোনো বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তখন তাকে কোনো কথা বাস্তবায়ন অথবা কোনো সত্য উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করতে কোনো কাপুরুষোচিত আচরণ না করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করছেন এই বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান রেখে তাকে তার ভাইকে সাহায্য করা উচিত। এই হাদীসে দরিদ্র ব্যক্তির আর্থিক বোঝা হালকাকরণের মর্যাদা আর ইলম অন্বেষণের পথে কঠোর চেষ্টার প্রচেষ্টার

মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর এর দ্বারাই ইলম অর্জনের পথে ব্যস্ত থাকার মর্যাদা অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হয়। এই ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শারঈ ইলম। তবে শর্ত হলো এই ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। যদিও এটা প্রত্যেক ইবাদতে শর্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যে কোনো সম্প্রদায়ের লোকগণ যখন আল্লাহর কোনো একটি ঘরে বসে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং একে অপরের সঙ্গে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে"। এই কথাটি মাসজিদে কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার মর্যাদার পক্ষে দলীল। এখানে "সাকীনা" দ্বারা উদ্দেশ্য কী এই বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: রহমত। তবে এটা দুর্বল মত। যেহেতু রহমত শব্দটি এই শব্দের পরেই 'আত্বফের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: সাকীনা হলো: প্রশান্তি এবং স্থিরতা। এই মতটিই অধিক সুন্দর। তাঁর বক্তব্য: "যেকোনো সম্প্রদায়" এখানে قوم — শব্দটি একটি অবিভক্ত অনির্দিষ্ট বাচক জাতীয় শব্দ। যেনো এখানে বলা হচ্ছে: যেকোনো সম্প্রদায়ই এই ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হোকনা কেনো, তাদের জন্য উল্লিখিত সকল মর্যাদা সাব্যস্ত হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তাদের জন্য আলেম, দুনিয়া বিরাগী ও পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার শর্ত আরোপ করেননি। আর "ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রেখেছে" এই বাক্যটি মহান আল্লাহ তা'আলার এই বাণী থেকে চয়নকৃত: حافين من حول العرش — চতুর্দিক হতে বেষ্টনকারীগণ" । অর্থাৎ আরশকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টনকারী। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হলো: ফেরেশতাগণ তাদের এত নিকটবর্তী যে, তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। এমনকি তারা শয়ত্বানের জন্য সামান্য পরিমাণ ছিদ্র ফাঁকা রাখেনি। তাঁর বক্তব্য: "এবং তাদেরকে রহমত আবৃত করে রাখে"। غشي — শব্দটি একমাত্র এমন ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, যেখানে আবৃতকারী বস্তুটি আবৃত বস্তুকে সকল দিক থেকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

শায়েখ শিহাবুদ্দীন ইবনু ফারজ বলেছেন: আমার মতে এখানে শব্দটির অর্থ হলো: রহমতের আচ্ছাদন এমনভাবে হয় যে, সেটা সকল প্রকার গুনাহকে — যা একজন ব্যক্তি করার প্রস্তুতি নিয়েছে — পরিবেষ্টন করে রাখে। ইনশা আল্লহু তা'আলা। তাঁর বক্তব্য: "এবং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন" । এই বাক্যটির দাবি অনুসারে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা নবীগণ ও মহান ফেরেশতাগণের নিকট তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

فضل الله تعالى ورحمته

হাদীস – ৩৭: আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ."رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي "صحيحيهما" بهذه الحروف .

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব হতে বর্ণনা করেন যে,

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ভালো ও মন্দ কাজকে লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এ ব্যাখ্যা করেন: যে ব্যক্তি ভালো কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারে না, তবু আল্লাহ তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; আর দৃঢ় সংকল্প করে সে যদি তা সম্পন্ন করে তবে আল্লাহ নিজের কাছে তার জন্য দশ নেকী থেকে সাতশ পর্যন্ত; বরং তার চেয়েও

বেশি নেকী লেখেন। এর বিপরীত, যদি কারো মন্দ কাজের বাসনা জাগে কিন্তু তা কাজে পরিণত না করে, আল্লাহ তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; কিন্তু যদি সে তার কামনা বাসনাকে কাজে পরিণত করে, তবে তার জন্য একটি মন্দ কাজ লেখেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/ ৬৪৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩১।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন: এটি একটি মহান মর্তবা সম্পন্ন হাদীস। যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের একটি পরিমাপ উল্লেখ করেছেন। তিনি বান্দার কোনো নেক কাজের চিন্তাকেও একটি নেকী বলে গণ্য করেছেন, যদিও বান্দা সেটা সম্পন্ন না করে। আর গুনাহের ব্যাপারে বান্দার চিন্তাকেও — যদি বান্দা সেটা চিন্তা করার পরে বর্জন করে — একটি নেকী বলে গণ্য করেছেন । যদিও বান্দা এখানে (চিন্তা করার দ্বারা) একটি গুনাহ সংঘটিত করেছে। আর যদি সে একটি নেক কাজ করে, তাহলে তার একটি নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার নামে দশটি নেকী লিখে দেন। আর তাদের নেক কাজের বিনিময় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া এবং গুনাহের বিনিময় কয়েকগুণ বৃদ্ধি না করা এটা মহা অনুগ্রহ। আর নেকী সম্পর্কে চিন্তা করাকেও তিনি নেকী বলে গণ্য করেছেন, কারণ নেকীর ইচ্ছা করাটা অন্তরের কাজ। যেহেতু উক্ত বিষয়ের অঙ্গীকার অন্তর দ্বারা সংঘটিত হয়।

যদি বলা হয়: এই কথা অনুসারে এই বিষয়টি জরূরী হয়: যে ব্যক্তি গুনাহের চিন্তা করেছে — কিন্তু গুনাহ সংঘটিত করেনি — তার নামে একটি গুনাহ লিখা। কারণ, কোনো বিষয়ে চিন্তা করাটাও অন্তরের কাজ। এই কথার উত্তরে বলা হবে: বিষয়টি তোমার ধারণার মত নয়। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ থেকে বিরত থাকল, সে গুনাহের আন্তরিক সিদ্ধান্তকে বর্জন করলো অপর একটি আন্তরিক সিদ্ধান্ত দ্বারা। যেই সিদ্ধান্তে সে কোনো নেক কাজ করার ইচ্ছা করেছে এবং গুনাহের সঙ্কল্পকারী মনোবাসনার বিরোধিতার করেছে। ফলে উক্ত সিদ্ধান্তের

বিনিময়ে তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়েছে। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

“একমাত্র আমার জন্যই সে গুনাহ পরিত্যাগ করেছে”। মুসলিম হা/১২৯। অর্থাৎ একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ন্যায়: “প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সাদাকা করা অত্যাবশ্যক”। তারা বললেন: যদি সে না করতে পারে? তিনি বললেন: তাহলে সে যেনো গুনাহ থেকে বিরত থাকে। কারণ, এটিও এক প্রকার সাদাকা”। বুখারী হা/১৪৪৫, মুসলিম হা/১০০৮। ইমাম বুখারী হাদীসটিকে শিষ্টাচার অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি বাধ্য হয়ে অথবা অপারগ হয়ে গুনাহ পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য এই নেকী লিখা হবে না। এই তার গুনাহ বর্জন এই হাদীসের মর্মে শামিল হবে না।

তাবারী বলেছেন: এই হাদীসে তাদের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়, যারা বলেছেন: নিশ্চয় সংরক্ষক ফেরেশতাগণ বান্দার কল্পনায় আসা নেকী ও গুনাহও লিপিবদ্ধ করেন। এবং উক্ত বিষয়ে তাদের বিশ্বাস বা সঙ্কল্প সম্পর্কেও তারা জানেন। এবং তাদের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যারা দাবি করেন: সংরক্ষক ফেরেশতাগণ একমাত্র বান্দার প্রকাশ্য অথবা শ্রবণযোগ্য আমলই লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো: কোনো বান্দার ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয় বান্দার অন্তরের কল্পনা সম্পর্কেও জানে। আর এটা সম্ভব যে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত জ্ঞানের রাস্তা তাদের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে অনেক নবীগণের ক্ষেত্রে ইলমুল গায়েবের রাস্তা উন্মোচিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে বলেছেন: তিনি ইসরাঈল সম্প্রদায়কে বললেন: “আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাদ্য ও তোমাদের ঘরে মজুতকৃত খাদ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে বলে দিতে পারব”। সূরা আলে ইমরান ৩:৪৯। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমুল গায়েবের অনেক বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এটা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব যে, আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদ্বয়ের জন্য আদম

সন্তানের অন্তরে বিদ্যমান নেকী ও গুনাহ সম্পর্কিত তথ্য জানার পথ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন কোনো আদম সন্তান অন্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প করে, তখন তারা তা লিখে নেয়। কেউ কেউ বলেছেন: এই তথ্য সম্পর্কে তারা জানতে পারে মানুষের অন্তর থেকে নির্গত এক ধরনের বাতাস থেকে। সালাফগণের মাঝে এই বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে যে, কোন যিকিরটি অধিক উত্তম: অন্তরের যিকির, নাকি বাহ্যিক যিকির। এই সম্পূর্ণ আলোচনাটি ইবনু খালফ তথা ইবনু বাত্বত্বাল এর আলোচনা। আর আল ইফসাহ গ্রন্থকার বলেছেন: যখন আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে পৃথকরূপে বাছাই করলেন, তখন তাদের বয়স সীমা হ্রাস করে দেওয়ায় তাদের আমলসমূহের কয়েকগুণ প্রতিদান তাদেরকে দান করলেন। সুতরাং কেউ একটি নেকী করার সঙ্কল্প করলে তাকে উক্ত সঙ্কল্পের বিনিময়ে একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে। যেহেতু সেটা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সঙ্কল্প। আর সেটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী বলা হয়েছে এই জন্য যে, কোনো ব্যক্তি যেনো এই ধারণা পোষণ না করে যে, শুধুমাত্র সঙ্কল্প করার দ্বারাই অর্জিত নেকীর পরিমাণ উক্ত সঙ্কল্পের কারণে হ্রাস হবে। অথবা সঙ্কল্পটি নেকীকে নিঃশেষ করে দিবে। তাই তিনি বিষয়টিকে স্পষ্টভাষায় এইভাবে বললেন: "একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী"।

আর যদি সে কোনো গুনাহের সঙ্কল্প করে এবং তা বাস্তবায়ন করে, তাহলে সে উক্ত কাজটিকে সঙ্কল্পের পরিধি থেকে বের করে আমলনামার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করলো। আর নেকীর সঙ্কল্পকারীর জন্য একটি নেকী লিখা হবে। এরপরে আবার উক্ত নেকীর সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। এই কথার অর্থ হলো: এই বিষয়টি নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা এবং সেই নিয়্যাতকে যথাযথ স্থানে বাস্তবায়নের পরিমাণ অনুযায়ী কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হবে। এরপরে বলেছেন: "অনেকগুণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে"। শব্দটিকে নাকিরাহ তথা অনির্দিষ্টবাচক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যা নির্দিষ্টবাচক শব্দের চাইতে অধিক অর্থবহ। এই বাচনভঙ্গির ভিত্তিতে এটা দাবি করা যায় যে, আধিক্যের মর্মকে

সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ বলে বিবেচনা করে তারপরে সেটার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাব করতে হবে। যেনো এই মহা অঙ্গীকার এই দাবিকেও শামিল করে নেয়: যখন কোনো মানুষ একটি গমের দানা সাদাকা করবে, আল্লাহ তা'আলার করুণায় তার জন্য উক্ত সাদাকার নেকী এই হিসাবে লিখা হবে: যদি উক্ত দানাটি সর্বোচ্চ উর্বর ভূমিতে রোপণ করা হয়, এবং যথাযথ সেটির পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে পানি সিঞ্চন করা হয়। এরপরে উক্ত উৎপন্ন ফসল কাটার পরে কর্তিত ফসলের দানা পুনরায় সর্বোচ্চ উর্বর ভূমিতে রোপণ করে পূর্বের নিয়মানুসারে সেটার যথাযথ পরিচর্যা করা হলে যেই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে এবং এইভাবে দ্বিতীয় বছর, এরপরে তৃতীয় বছর, এরপরে চতুর্থ বছর এবং পরবর্তী বছর যেই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে এবং এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকলে যেই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এর ফলে গম, রাই সরিষা এবং আফিমের একটি দানা বিরাটকায় পাহাড় ও পর্বতের রূপ পরিগ্রহ করবে। আর যদি সাদাকা বিন্দুর চাইতেও সামান্য পরিমাণ হয়, যা ঈমানের শ্রেণিভুক্ত। তাহলে উক্ত সময়ে ক্রয়যোগ্য বস্তুর লভ্যাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। আর এর পরিমাণ এইভাবে নির্ধারণ করা হবে: যদি সবচেয়ে বড় শহরে সবচেয়ে দামী বাজারে এই সামান্য বস্তুটিকে বিক্রি করা হয়, যেখানে উক্ত বস্তুটির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হবে। এরপরে উক্ত মূল্যকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর এইভাবে এই বস্তুটির বর্ধিত মূল্য কিয়ামত পর্যন্ত কয়েকগুণ করে বৃদ্ধি করা হতে থাকবে। এরপরে একসময় উক্ত বিন্দু পরিমাণ বস্তুটি তার বর্ধিত পরিমাণের মূল্য অনুসারে সমগ্র দুনিয়ার সমপরিমাণ (মূল্য ও গঠনের দিক থেকে) রূপ ধারণ করবে। একইভাবে সকল নেক আমলই আল্লাহ তা'আলার লেনদেন নীতি অনুসারে বিশাল আকার ধারণ করবে। যদি নেকীর তীরগুলো খাঁটি নিয়্যাতের সাথে নির্গত হয় এবং তা ইখলাছে ভরপুর ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়।

এই মহান প্রতিদানের মাঝে আরো রয়েছে: আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রূপান্তরের মাধ্যমে এই জাতীয় ক্ষেত্রে আরো অধিকগুণ বৃদ্ধি পায়: যখন

একজন মানুষ কোনো ফকীরকে এক দিরহাম মুদ্রা দান করে। এরপরে উক্ত ফকীর তার চাইতেও অধিক দরিদ্র অপর ফকীরকে দান করে দিল। এরপরে তৃতীয়জন চতুর্থ আরেকজনকে একইভাবে দান করে দিল। এরপরে চতুর্থজন পঞ্চম জনকে দান করলো। এইভাবে যতদূর পর্যন্ত এটা দীর্ঘায়িত হওয়া সম্ভব।

তাহলে আল্লাহ তা'আলা এখানে প্রথম সাদাকাকারীকে এক দিরহামের বিনিময়ে দশটি নেকী গণনা করবেন। যখন দিরহামটি দ্বিতীয় জনের নিকট স্থানান্তরিত হবে, তখন প্রথমজনের নেকী দ্বিতীয় জনের নিকট স্থানান্তরিত হবে। তখন দ্বিতীয় জন দশ নেকীর অধিকারী হবে। আর প্রথমজন এক হাজার নেকীর অধিকারী হবে। যখন দ্বিতীয় জন সেটা সাদাকা করে দিবে, তখন সে একশটি নেকীর অধিকারী হবে। আর দ্বিতীয় জন এক হাজার নেকীর অধিকারী হবে। আর প্রথম জন সহস্র নেকীর অধিকারী হবে। আর যখন তৃতীয় জন সাদাকা করবে, তখন সে একশটি নেকীর অধিকারী হবে। দ্বিতীয় জন দশ হাজার নেকীর অধিকারী হবে। এভাবেই দশটি নেকী অগণিত সংখ্যক নেকীতে রূপান্তরতি হবে। যার পরিমাণ একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। আরো নেকী প্রদান করা হবে: যখন মহান আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে স্বীয় মুসলিম বান্দার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তার নেকীসমূহ বৈচিত্রময় হবে। যেখানে কিছু নেকী হবে উচ্চমান সম্পন্ন। আর কিছু নেকী হবে নিম্নমান সম্পন্ন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ বদান্যতা ও অনুগ্রহের দ্বারা উক্ত উচ্চমান সম্পন্ন নেকীর চড়া মূল্যের দ্বারাই অন্যান্য নিম্নমান সম্পন্ন নেকীগুলোর মূল্যায়ন করবেন। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি সেই দিন সন্তুষ্ট হবেন, তার দুইটি নেকীর মূল্যমানের তফাৎ নিয়ে সমালোচনা করবেন এমন সমালোচনার অনেক উর্ধ্বে তাঁর মহত্ত্ব। বরং মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আমরা অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দিব" । যেমন কোনো বান্দা যখন মুসলিমদের কোনো বাজারে প্রবেশ কালে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করবে: "লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ...." শেষ

পর্যন্ত। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য বিশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন। তার আমলনামা হতে বিশ লক্ষ গুনাহ মুছে দিবেন। এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর এই হিসাব, যা আমরা বর্ণনা করলাম, তা আমাদের জানা পরিমাণ অনুসারে। আল্লাহ তা‘আলার করুণার অনুপাত হিসেবে নয়। কারণ, তা সৃষ্টিজীব কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি।

العبادة لله وسيلة القرب والمحبة

হাদীস – ৩৮: আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে তার ইবাদত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقْد آذَنْته بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ."رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমি যা তার ওপর ফরয করেছি আমার বান্দাহ্ তা ব্যতীত অন্য কোনো পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দাহ্ নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই; যা

দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই; যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই; যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই; যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী, হা/ ৬৫০২।]

ব্যাখ্যা: আল ইফসাহ গ্রন্থের লেখক বলেছেন: এই হাদীস থেকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়: আল্লাহর প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সতর্ক বার্তা প্রেরণ করেছেন: তিনি তার ব্যাপারে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, সে শুধুমাত্র শত্রুতা পোষণ করার দ্বারাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর শরীআত অনুকরণ করে। সুতরাং মানুষ যেনো আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাকে কষ্ট দেওয়া থেকে সাবধান থাকে। معاداة – শব্দের অর্থ হলো: কারোর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা। আমি মনে করি, বাক্যটির অর্থ হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের কারণেই শত্রুতা পোষণ করেছে। আর যদি সংঘাত সৃষ্টিকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের কারণে আল্লাহর দুইজন প্রিয় বান্দার মাঝে কোনো গভীর সত্য নির্ণয়ের স্বার্থে কোনো মুকাদ্দামা বা শুনানি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সেটা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আবূ বকর ও উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা এর মাঝে বিবাদ সংঘটিত হয়েছে। এবং আব্বাস ও আলী রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা এর মাঝে বিবাদ সংঘটিত হয়েছে। এবং অনেক সাহাবীদের মাঝে এমন বিবাদ সংঘটিত হয়েছে। আর তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁর বাণী: "আমার বান্দা যেসকল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, তার মাঝে আমার পক্ষ থেকে তার ওপরে ফরযকৃত ইবাদতই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এই হাদীসে ফরযের ওপরে নফলকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর নফলকে নফল (অতিরিক্ত) বলা হবে তখনি, যখন ফরয পালন সম্পন্ন হবে। অন্যথায় নফলের জন্য কখনো نافلة – নামটি প্রযোজ্য হবে না।

আর এই বিষয়ে তাঁর এই বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে: "আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি"। যেহেতু নফল একমাত্র ফরয পালনের পরেই আদায় করা হয়। আর যখনই কোনো বান্দা স্থায়ীভাবে আল্লাহর জন্য নফল আদায় করতে থাকে, তখন উক্ত আমল তাকে আল্লাহর ভালোবাসার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এরপরে তিনি বলেছেন: "আর যখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে"। শেষ পর্যন্ত। এটা ঐ আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়েছেন এমন ব্যক্তির বেলায়েতের নিদর্শন। এর অর্থ হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআত তাকে শুনার অনুমতি না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুনে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআত তাকে দেখার অনুমতি না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে দেখে না। একমাত্র শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত বস্তুর দিকেই সে নিজের হাত প্রসারিত করে। একমাত্র শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত গন্তব্যের দিকেই সে নিজের চরণকে পরিচালিত করে। এটাই হলো উক্ত বাণীর মূল মর্ম। তবে কখনো কোনো বান্দার ওপরে আল্লাহ তা'আলার যিকির এমনভাবে প্রাবল্য বিস্তার করে, এমনকি সে এর মাধ্যমে আল্লাহর অভিজ্ঞ ও নিবেদিত বান্দায় পরিণত হয়। যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে তাকে সম্বোধন করা হয়, তাহলে সে সম্বোধনকারীর কথা শুনতে পায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র যিকরের জন্য নিবেদিত প্রাণ বান্দাগণ ব্যতীত অন্যরা তাদের কথা তাকে শুনানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর যিকরের দ্বারা তার সঙ্গে সংযুক্ত না। একইভাবে দৃশ্যমান বস্তু, স্পর্শযোগ্য বস্তু ও পায়ে হেঁটে চলা গন্তব্যের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়। এটি একটি মহান গুণ। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো আমাদেরকে উক্ত গুণের অধিকারীদের মাঝে শামিল করে নেন। তাঁর বাণী: "যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করবো"। এই কথাটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, বান্দা যখন আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তার এই অবস্থান তার রবের নিকট যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার আবদার ও ভয়ের উদ্রেককারী ব্যক্তি

থেকে আশ্রয় প্রার্থনা থেকে বাধা দেয় না। আর আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনার পূর্বেই তাকে দান করতে সক্ষম। এবং তার আশ্রয় চাওয়ার পূর্বেই তাকে আশ্রয় দিতে সক্ষম। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকটে অবস্থান করেন প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা পূরণ করার দ্বারা এবং আশ্রয় কামনাকারীদেরকে আশ্রয় প্রদান করার মাধ্যমে। إستعاذني – শব্দটিকে মুহাদ্দিসগণ باء ও - نون – অক্ষরসহ আত্মস্থ করেছেন। উভয়টিই সহীহ। হাদীসের প্রথম অংশে তাঁর বাণী: "আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম" । آذنته - শব্দের হামযাটি হামযাহ মামদূদাহ। তাই হামযাটিকে লম্বা করে পড়তে হবে। অর্থাৎ: আমি ঘোষণা করলাম সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

التجاوز عن المخطئ والناسي والمكره

হাদীস – ৩৯: **ভুলকারী, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি ও বাধ্য হয়ে অন্যায় কর্মকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার সে কাজ যা করতে সে বাধ্য হয়েছে। হাসান হাদীস, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী ও আরো অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। [সহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/২০৪৫, বায়হাকী হা/১১৪৪৫।]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ﴾

"আর তোমাদের যেই মনোভাব রয়েছে, তা তোমরা প্রকাশ কর অথবা লুকিয়ে রাখ, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদেরকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন"। সূরা আল বাকারা ২:২৮৪। এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে: এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো, সাহাবীগণ — রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম — এর নিকট আয়াতটির দাবি অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তখন উমার, আবূ বকর, আব্দুর রহমান বিন আওফ ও মু'আয বিন জাবালসহ একদল লোক আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন: আমাদের ওপরে সাধ্যাতীত কঠোর আমলের দায়ভার অর্পিত হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ হয়তো মনে মনে এমন কথা বলে, যা তার অন্তরে — সমগ্র দুনিয়ার বিনিময়েও — বিদ্যমান থাকুক এটা সে পছন্দ করে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "বনী ইসরাঈল যা বলেছিল, তোমরাও বোধহয় তাই বলার চেষ্টা করছ: আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। বরং তোমরা বলো: আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তখন বিষয়টি তাদের নিকট অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। এই অবস্থায় তারা এক বছর অতিবাহিত করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই বাণীর মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান এবং রহমত নাযিল করলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾

"আল্লাহ তা'আলা কখনো মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে যা কল্যাণ অর্জন করবে, তা তারই উপকার সাধন করবে। আর সে যে অকল্যাণ সাধন করবে, তা তারই ক্ষতি করবে। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা (আপনার বিধি-নিষেধ মান্য করতে) ভুলে যাই অথবা আমরা কোনো (বিধি-নিষেধ পালন করতে) ভুলের শিকার হই"। সূরা আল বাকারা ২:২৮৬। আল্লাহ

তা'আলা বান্দার এই প্রার্থনা শুনে বলেন: "আমি গ্রহণ করলাম"। শেষ পর্যন্ত। সুতরাং প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে এবং প্রথম আয়াতটির বিধানকে সহজ করার ঘোষণা নিয়ে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। মুসতাদারাক হাকীম হা/৩১৩২।

ইমাম বায়হাক্বী ইমাম শাফেঈ হতে বর্ণনা করেন: মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾

"তবে ঐ ব্যক্তির কুফর ক্ষমার যোগ্য, যাকে কুফর সংঘটিত করতে কঠোরভাবে বাধ্য করা হয়েছে এবং তার অন্তর ঈমানী স্পৃহা (প্রশান্তি) দ্বারা পরিপূর্ণ"। সূরা আন নাহল ১৬:১০৬।

কুফরের কয়েকটি বিধান রয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলা তার দায় থেকে কুফরকে মুক্ত করে দিলেন, তখন জোরপূর্বক কুফরের মৌখিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত সকল বিধি-নিষেধ তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে গেল। কারণ, বড় বিধানটি দায়মুক্ত হয়ে গেলে ছোট বিধানটি অবশ্যই দায়মুক্ত হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা এর সূত্রে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের দায় থেকে অনিচ্ছায় সংঘটিত অন্যায়, বিস্মৃতিতে ঘটে যাওয়া অন্যায় এবং তাদেরকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত অন্যায়ের গুনাহ মুছে দিয়েছেন"। সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২০৪৫।

আয়িশা রদ্বীয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেছেন: "রাগের অবস্থায় সংঘটিত তালাক ও দাস মুক্তি কার্যকর হবে না"। হাসান: আবূ দাউদ হা/২১৯৩। এটা উমার, ইবনু উমার ও ইবনু যুবাইরের অভিমত। সাবিত বিন আহনাফ আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন খাত্তাব এর সন্তানের মাকে বিবাহ করেছিলেন। এরপরে সে সাবিতকে চাবুকের আঘাত ও ভয় দেখিয়ে ইবনু যুবাইরের খিলাফত কালে তাকে তালাক দিতে বাধ্য

করলো। তখন ইবনু উমার বললেন: তাকে দেওয়া তালাক তোমার জন্য প্রযোজ্য হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট ফিরে যাও। ইবনু যুবাইর তখন মক্কায় ছিলেন। তিনি (সাবিত) তার নিকট চলে গেলেন। তিনি মদীনায় নিয়োজিত তার গভর্নরকে তার ব্যাপারে এই মর্মে নির্দেশ জারি করে পত্র লিখলেন: তার স্ত্রীকে যেনো তার নিকট ফেরত দেওয়া হয়। এবং আব্দুর রহমান বিন যায়েদকে যেনো শাস্তি দেওয়া হয়। এরপরে আব্দুল্লাহ বিন উমারের স্ত্রী সফীয়াহ বিনতে আবূ উবাইদ সাবিতের জন্য তাকে প্রস্তুত করলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন উমার তার বিয়ের ভোজে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

الدنيا وسيلة ومزرعة للآخرة

হাদীস – ৪০: দুনিয়া হলো আখিরাত উপার্জনের ক্ষেত্র

عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّك غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِك لِمَرَضِك، وَمِنْ حَيَاتِك لِمَوْتِك .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন: দুনিয়াতে অপরিচিত অথবা ভ্রমণকারী মুসাফিরের মত হয়ে যাও। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন, সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা করো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। অসুস্থতার জন্য সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর মৃত্যুর জন্য জীবিত অবস্থা থেকে (পাথেয়) সংগ্রহ করে নাও। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত। [সহীহ বুখারী হা/ ৬৪১৬।]

ব্যাখ্যা: ইমাম আবূল হাসান আলী বিন খালফ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন: আবুয যিনাদ বলেছেন: এই হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো: অল্প সঙ্গ ও অল্প সঞ্চয় এবং দুনিয়ার বিষয়ে বিরাগীতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। আবূল হাসান বলেছেন: এর ব্যাখ্যা হলো: গরীব মানুষ মানুষের সঙ্গে আনন্দে সামান্যই যুক্ত হয়। তারা মানুষের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। যেহেতু গরীব যার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, সে তাকে চিনে না এবং অনুভবও করে না। কিন্তু সে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে আনন্দ ফুর্তিতে আরো বেশি অংশ নিতে চায়। তাই সে লাঞ্চিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। একইভাবে পথচারীকে তার সফরের পথ একমাত্র তার নিজ শক্তি বলেই অতিক্রম করতে হয়। তার হালকা বোঝার কারণে তার সফরের পথে বাধা প্রাপ্ত হয় না। তার গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট বাহন আর পাথেয় খাবার ব্যতীত তার সাথে আর কিছুই থাকে না। আর এই হাদীসটি দুনিয়াতে যুহদকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি নির্দেশ করছে। যেখান থেকে শুধুমাত্র পর্যাপ্ত এবং ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি গ্রহণ করতে হয় না। ঠিক যেভাবে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসাফিরের জন্য ন্যূনতম পাথেয় থেকে বেশি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ইযয আলাউদ্দীন বিন ইয়াহইয়া বিন হুবায়রাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

এই হাদীসে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীবের সঙ্গে সাদৃশ্য ধারণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন বলে বুঝা যায়। কারণ, ভিনদেশী বা অপরিচিত ব্যক্তি যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে, তখন সে উক্ত অঞ্চলের স্থানীয়দের মাজলিসে অংশগ্রহণ করে না। এবং কেউ তাকে অস্বাভাবিক পোশাকে দেখে ফেলবে এমন ভয়ও সে করে না। সে অন্যদের সঙ্গে গোপনে শত্রুতাও করে না। একইভাবে পথচারী এমন ব্যক্তি, যে কোনো ঘর তৈরী করে না। মানুষের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য ঝগড়া-বিবাদ সংক্রান্ত মামলায় নিজেকে জড়ায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সে তাদের সঙ্গে মাত্র সামান্য কিছু দিন অবস্থান করেছে। সুতরাং প্রত্যেক গরীব ও পথচারীর জীবনাচার একজন মুমিনের জন্য দুনিয়ার জীবনে বাস্তবায়ন করা মুস্তাহাব। কারণ, দুনিয়া তার স্থায়ী ঠিকানা নয়।

কারণ, এই অস্থায়ী ঠিকানা তাকে তার আসল ঠিকানা হতে আটকে রেখেছে। এই ঠিকানাই তার মাঝে এবং তার স্থায়ী ঠিকানার মাঝে বিদ্যমান একমাত্র ব্যবধান। আর ইবনু উমারের বক্তব্য: যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, ভোর হওয়ার অপেক্ষা করো না। আর যখন ভোরে উপনীত হবে, তখন সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা করো না। সুতরাং একজন মুমিন সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে এই বিষয়ের প্রতি তিনি উৎসাহিত করছেন। আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় নেক আমলের মাধ্যমে। তিনি অল্প আকাঙ্খার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন: অর্থাৎ তুমি কখনো রাতের আমল সকালে সম্পন্ন করার অপেক্ষায় থেকো না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে আমল সম্পন্ন করো।

একইভাবে যখন ভোরে উপনীত হবে, তখন নিজেকে সন্ধ্যার কথা বলে সকালের আমলকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করো না। তার বক্তব্য: "তোমার অসুস্থতার বিপরীতে যেই সুস্থতা আছে, সেটাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করো"। তিনি এখানে সুস্থতার সঠিক মূল্যায়নের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। অন্যথায় মানুষ অসুস্থতায় আপতিত হতে পারে এই ভয়ে কাজ থেকে বিরত থাকবে। একইভাবে তার এই বক্তব্য: "তোমার মৃত্যুর বিপরীতে তোমাকে যেই জীবন দেওয়া হয়েছে, সেটাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করো"। এখানে তার জীবনের দিন-কালকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো, তার আমল বন্ধ হয়ে গেল এবং তার মনোবাসনা নিঃশেষ হয়ে গেল। তার অবহেলা ও লজ্জার ব্যাপারে তার হতাশা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে। সে যেনো এটা উপলব্ধি করে যে, তার জীবনে একদিন এমন দীর্ঘ একটি কাল আসবে, যখন সে মাটির নীচে থাকবে। কিন্তু কোনো কাজ করতে পারবে না। তার জন্য তখন মহান আল্লাহকে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সে যেনো তার নিরাপদ জীবনকালেই নেক আমল করে নেয়। এই হাদীসটি কল্যাণময় বিষয়গুলোকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করেছে এবং উত্তমরূপে সংগ্রহ করেছে। কেউ কেউ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা আকাঙ্খা এর দীর্ঘতার সমালোচনা

করেছেন। তিনি বলেছেন: “তাদেরকে আপনি তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। তারা আহার করুক, উপভোগ করুক এবং তাদের আকাঙ্খা তাদেরকে আরো মাতাল করে রাখুক। অচিরেই তারা (বাস্তবতা) উপলব্ধি করতে পারবে”। সূরা আল হিজর ১৫:৩। আলী রদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: “দুনিয়া তাৎক্ষনিকরূপে মুখ ফিরিয়ে বিদায় নিচ্ছে। আর আখিরাত সম্মুখ ভবিষ্যতের গন্তব্যরূপে যাত্রা শুরু করেছে। আর প্রত্যেকেরই সন্তান আছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কারণ, আজ আমলের দিবস, হিসাবের নয়। আর আগামী কাল হিসাবের দিবস, আমলের নয়”। বুখারী ৬৪১৭ নং হাদীসের তালিক।

আনাস রদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কয়েকটি রেখা টানলেন। এরপরে বললেন: “এই রেখাটি হলো মানুষ। আর এই রেখাটি হলো তার আকাঙ্খা। আর এই রেখাটি হলো তার মৃত্যুক্ষণ। সে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই সহসা তার নিকট সবচেয়ে নিকটতম রেখাটি চলে আসল”। বুখারী হা/৬৪১৮। এই রেখাটি হলো তার মৃত্যুক্ষণ। যা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই হাদীসটিতে আকাঙ্খাকে হ্রাস করা এবং সহসাই আসতে পারে এই ভয় মৃত্যুর মেয়াদকে সামান্য মনে করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যার থেকে মৃত্যুর মেয়াদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, মৃত্যু অতর্কিতভাবে ও উদাসীন অবস্থায় তার ওপরে আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে মৃত্যু ঘটার প্রত্যাশা করার ও মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকার অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি সে। সুতরাং মুমিন যেনো যে বিষয়ে তাকে সতর্ক করা হয়েছে তা ব্যবহার করার ওপরেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেনো তার আকাঙ্খা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখে। কারণ, মানুষ জন্ম সূত্রেই আকাঙ্খা প্রিয়।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন: আমাকে একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, আমি ও আমার মা একটি দেয়াল নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাদামাটি লেপন করছিলাম। তখন তিনি বললেন: “হে আব্দুল্লাহ, এটা কী”? আমি বললাম: দেয়ালের

কাঠামো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই আমরা তা সংস্কার করছি। তখন তিনি বললেন: “আসল বিষয়টি (মৃত্যু) এর চাইতেও অধিক গতিশীল”। সহীহ: আবূ দাউদ হা/৫২৩৫, তিরমিযী হা/২৩৩৫।

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আমাদেরকে যেনো দুনিয়া বিরাগী বানিয়ে দেন। তাঁর নিকটে বিদ্যমান বস্তুর দিকে যেনো আমাদের আগ্রহকে স্থানান্তরিত করে দেন। কিয়ামত দিবসকে যেনো আমাদের চূড়ান্ত প্রশান্তিরূপে নির্ধারিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি মহান দানশীল। অতীব দয়ালু। ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

علامة الإيمان

হাদীস – ৪১: ঈমানের লক্ষণ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ." حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ "الْحُجَّةِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুগত না হয়ে যায়। হাদীসটি হাসান, সহীহ। এটাকে আমি কিতাবুল হুজ্জাহ্ থেকে সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেছি। [সনদ যঈফ: আল হুজ্জাহ, ইবনে মাকদেসী ২/৩৯৩।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি মহান আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর ন্যায়:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾

"কিন্তু বিষয়টি তারা যা মনে করে, তা নয়। আপনার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ সমাধানে আপনাকে বিচারক হিসাবে মান্য না করবে এবং আপনার সিদ্ধান্তে তারা নিজেদের মনে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা অনুভব না করবে এবং পূর্ণরূপে আপনার সিদ্ধান্তকে মেনে না নিবে"। সূরা আন নিসা ৪:৬৫।

আয়াতটির শানে নুযূল হলো: যুবাইর রদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মাঝে এবং জনৈক আনসারী সাহাবীর মাঝে পানি নিয়ে একটু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন তারা উভয়েই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বললেন: "হে যুবাইর, তুমি পানি সিঞ্চন করো এবং তোমার প্রতিবেশীর জমিতে পানি যাওয়ার রাস্তা মুক্ত করে দাও"। তিনি এর দ্বারা পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং ছাড় প্রদানের প্রতি উভয়কে উৎসাহিত করলেন। তখন আনসারী সাহাবী বললেন: সে কি আপনার ফুফাত ভাই হওয়ার কল্যাণে এই সুবিচার পেল?

তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারার রং পাল্টে গেল। তখন তিনি বললেন: "হে যুবাইর! পানি যতক্ষণ পর্যন্ত দেয়াল সমপরিমাণ না হয়, ততক্ষণ পানি আটকে রাখো। এরপরে পানি ছেড়ে দাও"। সহীহ বুখারী হা/২৩৫৯-২৩৬০, মুসলিম হা/২৩৫৭।

এখানে প্রথমে মূলত আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইরকে আনসারী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আনসারী ব্যক্তি তাঁকে রাগান্বিত করলো, তখন তিনি যুবাইরের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার একমাত্র যুবাইরের জন্যই ধার্য করে দিলেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "ঐ মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট আমি তার মা-বাবা, তার সন্তান ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হব"। সহীহ বুখারী হা/১৫।

আবুয যিনাদ বলেছেন: এই হাদীসটি অন্যতম একটি বহুবিধ অর্থবোধক বাক্য। কারণ, এই অল্প শব্দ বিশিষ্ট বাক্য অনেকগুলো অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেহেতু ভালোবাসা তিন প্রকার। এক: সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ভালোবাসা। যেমন: পিতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। দুই: স্নেহ ও অনুগ্রহপূর্ণ ভালোবাসা। যেমন: পিতার ভালোবাসা সন্তানের প্রতি। তিন: পছন্দনীয়তা ও মনের মিলের ভিত্তিতে ভালোবাসা। যেমন: মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

সুতরাং তিনি এই হাদীসে সকল প্রকার ভালোবাসাকেই অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন। ইবনু বাত্তাল বলেছেন: হাদীসটির অর্থ – আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন – হলো: যে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে বুঝবে যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকার ও তাঁর মর্যাদা তার জন্য তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের অধিকারের চাইতে অধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেছেন। তাকে বিভ্রান্তি থেকে হেদায়েতের দিশা দিয়েছেন। হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (আদর্শ) স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করা। সাহাবীগণ রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে তাদের পিতা, পুত্র ও ভাইদের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে লড়াই করেছেন। আবূ উবায়দাহ নিজ পিতাকে হত্যা করেছেন এই জন্য যে, সে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। আবূ বকর রদ্বীয়াল্লাহু আনহু তারই পুত্র আব্দুর রহমানের মুখোমুখি হয়েছিলেন বদরের ময়দানে। হয়তো তিনি সম্ভব হলে তাকে হত্যা করতেন। যে নিজের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির

উপস্থিতি উপলব্ধি করবে, সে নিশ্চিত হতে পারবে যে, তার মন-মস্তিষ্ক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দীনের অনুগামী।

سعة مغفرة الله تعالى

হাদীস – ৪২: আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমার ব্যাপকতা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তুমি যা-ই প্রকাশ করো না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেব- আর আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ্ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে (আখেরাতে) সাক্ষাত কর, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো। তিরমিযীতে বর্ণিত, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। [সহীহ, আল্লামা আলবানী। সুনানে তিরমিযী হা/৩৫৪০।]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসে একটি মহা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বান্দার প্রতি আল্লাহ তা‘আলার সহনশীলতা, বিরাট বদান্যতা এবং অগণিত, অসংখ্য অনুগ্রহ, ইহসান, দয়া, স্নেহশীলতা ও করুণার কথা বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ لَوْ وَجَدَهَا

তোমাদের কেউ যখন তার হারিয়ে যাওয়া বস্তু পুনরায় ফিরে পেলে অত্যধিক খুশী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবার প্রতি তার চাইতেও বেশি খুশী হন"। [সহীহ মুসলিম হা/২৬৭৫।]

আবূ আইয়ূব রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন তার মৃত্যু সন্নিকটে আসল, তিনি বললেন: আমি তোমাদের থেকে একটি বিষয় এতদিন পর্যন্ত গোপন রেখেছি। যা আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ

"যদি তোমরা গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে। এরপরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন"। [সহীহ মুসলিম হা/২৭৪৮।] এই হাদীসটির অনুরূপ অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বাণী: "হে আদম সন্তান! নিশ্চয় তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আহবান করবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে"। এই বাণীটি তাঁর এই বাণীর সমার্থক:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

"আমার প্রতি আমার বান্দা যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সঙ্গে ঠিক তেমনি আচরণ করি। সুতরাং সে আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখতে চায়, রাখুক"। [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ]

এমনও বর্ণনা এসেছে: "বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে এরপরে লজ্জিত হয়ে সে বলে: হে আমার রব! আমি গুনাহ করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। তিনি বলেছেন: তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা এটা বিশ্বাস করে যে, তার এমন একজন রব আছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি

যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপরে সে একই কাজ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার করে, আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বারই একই কথা বলেন। এরপরে বলেন: তোমার যা ইচ্ছা হয়, তুমি তাই করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম"। অর্থাৎ যখন তুমি গুনাহ সংঘটিত করার পরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। [সহীহ বুখারী হা/৭৫০৭।] জেনে রাখো, তাওবার তিনটি শর্ত আছে:

১. স্থায়ীভাবে গুনাহ পরিত্যাগ করা।

২. যা ঘটে গেছে সেই বিষয়ে লজ্জিত হওয়া।

৩. পুনরায় একই গুনাহ না করার মর্মে প্রতিজ্ঞা করা।

যদি গুনাহ মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা উক্ত ব্যক্তিকে পরিশোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া এবং উক্ত দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আর যদি গুনাহ তার মাঝে এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে বিদ্যমান কোনো বিষয় কেন্দ্রিক হয়, আর উক্ত বিষয়ে কাফফারার বিধান থাকে, তবে কাফফারা আদায় করা অপরিহার্য। এটা চতুর্থ শর্ত। যদি এই কাজটি মানুষ দৈনিক বারংবার করতে থাকে এবং যাবতীয় শর্ত মেনে তাওবা করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

তাঁর বাণী: "তোমার দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছে"। অর্থাৎ তোমার বারংবার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ"। "আমি কোনো পরোয়া করি না"। অর্থাৎ আমি তোমার গুনাহসমূহের ব্যাপারে কোনো পরোয়া করি না।

তাঁর বাণী: "হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহসমূহ আসমানের দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এরপরে তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব"। অর্থাৎ গুনাহসমূহের অবকাঠামো যদি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে। এটা হলো অধিক অনুপাতের সর্বোচ্চ সীমা। কিন্তু ঐ মহান সত্তার বদান্যতা, সহনশীলতা এবং ক্ষমা এর চাইতেও অধিক এবং আরো বড়। উভয়টির মাঝে অন্য কোনো সংযোগ নেই। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানেরও কোনো সুযোগ নেই।

সমগ্র জাহানের গুনাহ্ তাঁর সহনশীলতা ও মার্জনার সামনে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তাঁর বাণী: হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার নিকট যমীনের সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হও। কিন্তু এরপরেও আমার সঙ্গে কোনো বস্তুকে অংশীদার (শিরক) সাব্যস্ত না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে যমীনের সমপরিমাণ ক্ষমা দিয়ে বরণ করে নিব"। অর্থাৎ যদি তুমি আমার নিকট যমীনের সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হও। তাঁর বাণী: "এরপরে যদি তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর"। অর্থাৎ যদি তুমি আমার সঙ্গে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত না করে মৃত্যুবরণ কর। স্বীয় রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যতীত একজন মুমিনের কোনো অন্তর কখনো প্রশান্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন"। সূরা আন নিসা ৪:৪৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

যে ব্যক্তি গুনাহ করার পরপরই ক্ষমা চায়, সে বারবার গুনাহকারী গণ্য হবে না। যদিও সে দৈনিক সত্তর বার ঐ পাপে লিপ্ত হয়। [যঈফ: সুনানে আবূ দাউদ হা/১৫১৪, তিরমিযী হা/৩৫৫৪, মেশকাত হা/২৩২৪।]

আবূ হুরায়রা রদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

حُسْنُ الظَّن مِن حُسْنِ العِبادَة

উত্তমভাবে আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো তার ওপর উত্তম ধারণা পোষণ করা। [যঈফ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৯৯৩।]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৫. আকীদাতুত তাওহীদ
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৬. আল ইরশাদ- সহীহ্ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
-ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১০. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১৩. নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৩. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৪. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৫. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩০. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ্ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৩১. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৪. ইমাম নব্বীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

-ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৫. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

৩৬. মুখতাসার ফিক্বহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক্ব [নির্ধারিত মূল্য : ৯০০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]